মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে
এবং
তার গোলাম গিরি

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং তাঁর গোলামগিরি

রণজিত কুমার সিকদার

"পুরোহিততন্ত্র ভারত বিধ্বংসী বিষ। লাথি মেরে পুরোহিতদের দূর কর ; কারণ তারা সর্বদা প্রগতির বিরোধী। ব্রাহ্মণরা গরীব ভারতবাসীর রক্ত শোষণকারী। তারা কখনো গরীবদের উন্নতির জন্য এতটুকু চেষ্টাও করে নি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

MAHATMA JYOTIRAO PHULE Rs. 20.00
EBANG TAR GOLAMGIRI

Published by Dr. Ambedkar Prakashani
Publisher : Sm. Renu Sikdar
P.O & Vill—Dhalua, Dist. S—24 Pargana
West Bengal, Pin—743516, Phone : 462-0440

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী পক্ষে
প্রকাশিকা : শ্রীমতী রেণু সিকদার
গ্রাম ও পোস্ট ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫১৬

প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা (২২ মে, ১৯৯৭)

মুদ্রাকর : দুলাল চন্দ্র মান্না
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিণ্টিং, ১৯ই ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান : ১। রণজিত কুমার সিকদার
গ্রাম ও পোস্ট—ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭১৩৫১৬
(গড়িয়া রেল স্টেশন থেকে পূর্বদিকে ৫ মিনিট পথ)

২। আম্বেদকর ভবন
৩৮বি, স্কট লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : RS. ৪০ ত্র

লেখকের কথা

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম সমাজ বিপ্লবী, যিনি মনে প্রাণে এবং কথায় ও কাজে ছিলেন বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের দরদী বন্ধু। বর্ণাশ্রমের নামাবলী পরা মনুবাদী সমাজের অধিকারহীন শূদ্র বর্ণের মানুষ ছিলেন তিনি। যুগ যুগ ধরে ব্রাহ্মণদের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার ছিল এই শূদ্র সমাজ। ব্রাহ্মণদের শোষণ ও বঞ্চনাকে শূদ্রা তাদের বিধি-লিপি বলে মেনে নিয়েছিল। প্রবল আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন জ্যোতিরাও ব্রাহ্মণদের শোষণ ও বঞ্চনাকে মেনে নিতে পারেন নাই। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য-বাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামের অনন্য হাতিয়ার ছিল তাঁর লেখনী। লেখনীর মাধ্যমেই তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের কলা-কৌশল ও ধোঁকাবাজির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ভারতে মনুবাদের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম হাতিয়ার তুলে ধরেছেন। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর।

এই গ্রন্থটির তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বোম্বের জনপ্রিয় জীবনীলেখক ধনঞ্জয় কীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Mahatma Jotirao Phoole' থেকে। এছাড়া এই গ্রন্থের 'গোলামগিরি' অংশটুকু মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরাও রচনাবলীর ১ম ভলুম Slavery র সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ। তাছাড়া বাংলা ভাষায় মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের প্রথম জীবনী লেখক শ্রীনকুল মল্লিকের 'মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে' পুস্তকটি থেকেও কিছু কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নকুলবাবু সম্মতি দান করাতে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের জীবনী গ্রন্থটি আরো বিস্তারিত করে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু সময়াভাবে সংক্ষিপ্ত করেই করতে হল। তবে গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা রইল।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২২ মে, ১৯৯৭ — বিনীত,

চালুয়া, দঃ ২৪পরগনা — রণজিত কুমার সিকদার

সূচীপত্র

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং তার গোলামগিরি

যুগ পরিচিতি

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতের নব জাগরণের যুগ। বিগত তিন হাজার বছর ধরে ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সমাজ কাঠামো একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও সমাজ-কাঠামোতে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল। মুষ্টিমেয় কতিপয় বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণরাই ছিল সমাজব্যবস্থার ধারক-বাহক ও চালক। সমাজের সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমজীবী জনসাধারণ ছিল অজ্ঞ ও নিরক্ষর। কারণ সমাজের বৃহত্তম জনসমাজ শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের শিক্ষা লাভের অধিকারই ছিল না। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ব্রাহ্মণের বিধানকে অবনত মস্তকে মান্য করে চলত। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষিত ও চতুর ব্রাহ্মণরা তাদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে এবং মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পশুবৎ জীবনযাপনে বাধ্য করেছে।

ভারতে ইংরেজশাসন কায়েম হওয়ার পর ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতীয় জনজীবনে ইউরোপের আধুনিক মুক্ত চিন্তাধারার ছোঁয়া লাগে। সর্বসাধারণের জন্য স্কুলশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার বাতায়ন পথে ইউরোপীয় আধুনিক মননশীলতা ভারতবাসীর মনে মানবিক মূল্যবোধের মানদণ্ড বহন করে নিয়ে আসে। হাজার হাজার বছর ধরে যারা ছিল শিক্ষা জগৎ থেকে নির্বাসিত, ইংরেজী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ তাদের মনোজগতে চিন্তা, চেতনা ও অধিকারবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজজীবন সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের মনে অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। তারা যুগযুগান্তের বঞ্চনা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। হাজার হাজার বছর ধরে কুসংস্কারের অন্ধকারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের জীবনে আলোর আবির্ভাব ঘটল।

ভারতের সমাজ জীবনে এ এক মৌলিক পরিবর্তন ; এ এক বিরাট পরিবর্তন। হিন্দু সমাজব্যবস্থার নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে চেতনার এই আলোকচ্ছটায় যার জীবন সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তিনি হলেন ভারতের পশ্চিম দিগন্তের উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক মহাত্মা জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নির্মমভাবে শোষিত ও নির্যাতিত শূদ্র সমাজের তিনিই ছিলেন মুক্তিপথের প্রথম দিশারী। ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণধর্মী সমাজব্যবস্থাকে তিনিই প্রথম প্রতিবাদের কশাঘাতে হতচকিত করে দিয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের শূদ্র ও অতিশূদ্র অস্পৃশ্যদের জীবনে সচেতন নবযুগের সূচনা করে-ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্রীতদাসত্ব থেকে তিনিই অকম্পিত কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন মুক্তিবার্তা। তাই তাকে বলা হয় 'ভারতের জনজীবনের যুগস্রষ্টা'।

ইংরেজী শিক্ষার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের পূর্ব প্রান্তে নূতন যুগের আলোক বার্তা যেমন বহন করে এনেছিলেন বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সন্তান রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে নূতন যুগের বার্তা বহন করে এনেছিলেন শূদ্র সমাজের বরেণ্য সন্তান মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

১৮২৭ সালে পুনাতে এক মালী পরিবারে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল গোবিন্দরাও ফুলে এবং মাতার নাম ছিল চিমনবাঈ। পিতা গোবিন্দরাও ছিলেন পুনার একজন প্রতিষ্ঠিত ফুল বিক্রেতা।

জ্যোতিরাও এর পূর্ব পুরুষেরা কিন্তু পুনার বাসিন্দা ছিলেন না। গোবিন্দরাও ফুলের ঠাকুর্দা ছিলেন মহারাষ্ট্রের সাতারা জিলার কাতাগান গ্রামের অধিবাসী। গোবিন্দরাও ফুলের ঠাকুর্দা কিন্তু ফুলে ছিলেন না। তাদের পারিবারিক উপাধি ছিল গোরে। তিনি ছিলেন একজন গ্রাম্য চৌকিদার। মারাঠী ভাষায় চৌকিদারদের বলা হত চৌগুলা। ঐ গ্রামের কুলকার্নি ছিল একজন ব্রাহ্মণ। কোন কারণে এক সময় কুলকার্নির সঙ্গে চৌগুলার বিবাদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত চৌগুলাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়।

তিনি সপরিবারে পুনা জিলার খানওয়াদি গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। তার একমাত্র পুত্র সেতিবা গোরে খুব অলস প্রকৃতির ছিলেন। সেতিবার তিন পুত্র রণদি, কৃষ্ণ এবং গোবিন্দ। পিতা অলস প্রকৃতির হওয়াতে ছেলেদের বাল্যকাল থেকেই কাজে নামতে হয়। প্রথম দিকে তারা এক গ্রাম্য মোড়লের গরু চরাতেন। তারা খুব পরিশ্রমী ও সৎ প্রকৃতির হওয়াতে কিছুকাল পরেই তারা পেশোয়া দ্বিতীয় বালাজীর বাড়ীতে ফুলের যোগান দেওয়ার কাজ পান। ফলে পেশোয়ার অনুগ্রহে ফুলের চাষের জন্য কিছু জমিজমা তারা পান। ভাইদের মধ্যে গোবিন্দরাও খুব পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ফুল ও মালা বিক্রী করার জন্য তিনি পুনাতে একটি দোকান করেন। এই সময় গোরে উপাধির পরিবর্তে তার উপাধি হয় ফুলে। এই হল গোরে পরিবারের ফুলে হওয়ার ইতিহাস।

ফুলের চাষ ও ফুল বিক্রী করে গোবিন্দরাও আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেন। এরপর পুনার নিকটবর্তী কাবাদি গ্রামের

মালী সমাজের এক জাগড়ে পাতিলের মেয়ে চিমনবাঈ এর সঙ্গে গোবিন্দরাও এর বিবাহ হয়। গোবিন্দরাও-এর প্রথম পুত্রের নাম রাজারাম। দ্বিতীয় পুত্র জ্যোতিরাও-এর জন্মের মাত্র ১ বছর পরেই মাতা চিমনবাঈ মারা যান। গোবিন্দরাও তার পত্নীকে খুব ভালবাসতেন। ফলে পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন না। তিনি শিশু জ্যোতির জন্য একজন নার্স নিযুক্ত করলেন। এই নার্সটি অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন। তিনি খুব যত্নসহকারে শিশু জ্যোতির পরিচর্যা করতেন। ফলে গোবিন্দরাও নিশ্চিন্তমনে তার চাষবাস ও দোকানের দেখাশোনা করতে থাকেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষালাভ

ফুলে পরিবারে ইতিপূর্বে কেউ লেখাপড়া শেখেন নি। গোবিন্দরাও ভাবলেন তিনি তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন। তাই তাকে গ্রামের একটি পাঠশালাতে ভর্ত্তি করে দিলেন। তৎকালে সরকারী স্কুলের রেওয়াজ ছিল না। লেখাপড়া জানা ব্রাহ্মণরা নিজের বাড়ীতে বা মন্দিরে বসে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত না। তখনকার দিনে কোন ছাপা বই ছিল না। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে শিক্ষক পড়াতেন। এই সব হাতে লেখা বইতে সাধারণতঃ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, পৌরাণিক এবং ধর্মীয় উপদেশাবলী থাকত।

সৌভাগ্যের কথা এই সময় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বৃটিশ সরকার গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গোবিন্দরাওদের গ্রামেও একটা সরকারী স্কুল খোলা হয়। ফলে জ্যোতিরাও-এর ইংরেজী শিক্ষালাভের পথ সুগম হয়। সাত বছর বয়সে জ্যোতিরাও-এর প্রাথমিক শিক্ষা সুর হয়।

জ্যোতিরাও খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এই সময় গোবিন্দরাও-এর দোকানে হিসাবপত্র লেখার জন্য একজন ব্রাহ্মণ কেরানী কাজ করত। ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণদের শিক্ষালাভ মোটেই প্রীতির চোখে দেখত না। জ্যোতিরাও-এর লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে তার খুব গাত্রদাহ সুরু হয়। সে গোবিন্দরাওকে পরামর্শ দিতে থাকে যে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার কোন লাভ হবে না; বরং লেখাপড়া শিখলে ছেলে তার চাষবাসে লাগবে না এবং ফুলের ব্যবসায়েও মনোযোগ দেবে না। ফলে তার সব দিক দিয়েই ক্ষতি হয়ে যাবে। তাছাড়া ইংরেজী শিখলে তার ছেলের হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ কমে যাবে এবং অধার্মিক জীবনযাপন করে তার বংশকে কলঙ্কিত করবে। এরূপ পরামর্শের ফলে গোবিন্দরাও জ্যোতিরাওকে প্রাথমিক শিক্ষার পরেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে সাংসারিক ও চাষের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

জ্যোতিরাও যেমন পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন তেমনি ফুলের চাষেও খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তার সবল দেহ এবং মন যখন ফুলের চাষে যত্নশীল হয়ে উঠল, তখন ফুলের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি নিরলস-ভাবে পরিশ্রম করতেন। তবে সন্ধ্যার পরে এবং অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরণের বই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়তেন। চাষের কাজে যত্নশীল হলেও পড়াশুনার প্রতি তার আগ্রহ কোন অংশে কম ছিল না।

তৎকালে মারাঠী সমাজে অল্প বয়সে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল। জ্যোতিরাও-এর বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন গোবিন্দরাও তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ৮ বৎসরের বালিকা সাবিত্রীবাঈয়ের সঙ্গে খুব ঘটা করে জ্যোতিরাও-এর বিবাহ দেওয়া হল। বিবাহ সম্পর্কে জ্যোতিরাও-এর তখন কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সুতরাং বিবাহ তার জীবনে সেই সময় কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি।

জ্যোতিরাও-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিলেন গফ্‌ফর মুন্সী। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। আর একজন প্রতিবেশী ছিলেন মিঃ লেগিট। মিঃ লেগিট ছিলেন একজন খৃষ্টান মিশনারী। তারা জ্যোতিরাও-এর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করেন। তারা গোবিন্দরাওকে তার ছেলেকে হাই স্কুলে ভর্তি করার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতে থাকেন। এই দুইজন শিক্ষকের কথা জ্যোতিরাও সারাজীবন স্মরণ করেছেন। জ্যোতিরাও-এর শিক্ষার জন্য এরা আগ্রহী না হলে জ্যোতিরাও-এর আর পড়াশুনা হত কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণরা কখনো চাইত না অব্রাহ্মণ কেউ লেখাপড়া শিখুক। বরং যাতে অব্রাহ্মণ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া না শেখে, তজ্জন্য তারা অভিভাবকদের সর্বদা নানাপ্রকার কুপরামর্শ দিত।

যাহোক ছেলের পড়াশুনার আগ্রহ দেখে এবং মুন্সী সাহেব ও মিঃ লেগিটের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ১৯৪১ সালে গোবিন্দরাও জ্যোতিরাওকে পুনার স্কটিশ মিশন হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। এই সময় জ্যোতিরাও হিন্দুধর্মের নানাপ্রকার কুসংস্কার এবং ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন প্রকারের বঞ্চনামূলক চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত

হন। এই স্কুলে সদাশিব গোবান্দে নামক একজন ব্রাহ্মণ ছাত্রের সঙ্গে জ্যোতিরাও-এর বন্ধুত্ব হয় এবং এই বন্ধুত্ব তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারা উভয়ে টমাস পাইনের 'দি রাইটস অব ম্যান' নামক একখানি গ্রন্থের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষ এবং মানবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে। এরা মারাঠী কেশরী শিবাজী এবং আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী পাঠ করে তাদের বীরত্ব ও দেশাত্মবোধের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং মাতৃভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হতে থাকেন।

জ্যোতিরাও কেবল মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না, খুব মেধাবী ছাত্রও ছিলেন। তিনি প্রতি শ্রেণীতে প্রতি বছর প্রথম স্থান লাভ করে ১৮৪৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী তার মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, দেশাত্মবোধের আদর্শকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও তিনি স্থির করলেন যে, তিনি জীবনে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করবেন না।

———

শিক্ষাব্রতী জ্যোতিরাও

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জ্যোতিরাও কি করবেন সেই চিন্তা তাঁর মনে উথালপাথাল সৃষ্টি করল। অন্য কেউ হলে হয় সরকারী চাকুরী, অথবা পিতৃব্যবসায়ের বাঁধা-পথে জীবনের গতিধারা প্রবাহিত করাতেন। জ্যোতিরাও-এর জন্ম বাঁধা-পথে চলার জন্য হয় নি; তিনি এসেছেন নূতন পথ সৃষ্টি করতে। এই সময় ব্রাহ্মণ পেশোয়া-শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ সরকার নূতন শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন। মারাঠী ব্রাহ্মণরা দেশাত্ম-বোধের অজুহাতে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য পেশোয়া-শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও চক্রান্ত সুরু করে। অনেককে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হয়। এই আন্দোলনে মহারাষ্ট্র তখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

এই সময় জ্যোতিরাও-এর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা হিন্দু সমাজের আসল চেহারাটা জ্যোতিরাওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও তাঁর এক বন্ধুর বিয়েতে বন্ধুর একান্ত অনুরোধে বরযাত্রী হলেন। বরযাত্রীদের মিছিলে ছিল ব্রাহ্মণ যুবাবৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা। একমাত্র জ্যোতিরাও ছাড়া অব্রাহ্মণ কেউ সেই মিছিলে ছিল না। মিছিল কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কুলীন ব্রাহ্মণরা জানতে পারল যে, জ্যোতিরাও একজন মালীর ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন চীৎকার করে বলল, "ওহে মালীর ছেলে, কোন সাহসে তুই শূদ্র হয়ে আমাদের সঙ্গে মিছিল করে চলছিস। সামাজিক বিধান অগ্রাহ্য করে তুই ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করেছিস। দু' অক্ষর ইংরেজী শিখে তোর এত ধৃষ্টতা জন্মেছে যে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক মিছিলে চলার সাহস দেখাচ্ছিস। এক্ষুনি মিছিল থেকে বেরিয়ে যা।"

অপমানে জ্যোতিরাও-এর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। কোন প্রকার বাক্যালাপ না করে মিছিল থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা বাড়ী ফিরে এলেন। উত্তেজিত জ্যোতিরাও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাঁর বাবাকে সব ঘটনা জানালেন। বাবা তাকে বললেন,

এটাই সামাজিক রীতি। হাজার হাজার বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে। ব্রাহ্মণরা সমাজের গুরু। তারা দেবতুল্য। তুমি যত লেখাপড়া শেখ না কেন, ওদের সমতুল্য কোনদিন হতে পারবে না। কেন তুমি ওদের সঙ্গে বরযাত্রী হতে গেলে? এটা তোমারই ভুল।

জ্যোতিরাও তাঁর বাবার অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি ছত্রপতি শিবাজী, জর্জ ওয়াশিংটন, মার্টিন লুথারের জীবনী পড়েছেন এবং তাদের মানবিক আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মণদের এই অযৌক্তিক একাধিপত্য কি তিনি মেনে নিতে পারেন? তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, ব্রাহ্মণদের এই সামাজিক একাধিপত্যকে নস্যাৎ করে তিনি অব্রাহ্মণদের মানবিক মূল্যবোধকে ঊর্ধে তুলে ধরবেন। হিন্দু সমাজে অব্রাহ্মণ বিশেষতঃ শূদ্রদের দারিদ্র্য ও মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। দাম্ভিক ব্রাহ্মণদের তিরস্কারের চেয়ে ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর বাবার দাসত্ববোধ তাঁকে বেশী বিচলিত করে তুলল। তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন যে, বাকী জীবনে তিনি ব্রাহ্মণদের গর্বিত একাধিপত্য চূর্ণ করে অব্রাহ্মণদের হীনতাবোধ ও দাসত্বমূলক সংস্কার ভেঙ্গে তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাবেন।

১৮৪৮ সাল সারা বিশ্বের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অশনিসংকেত দান করেছে। এই বছর কার্ল মার্কস লণ্ডন থেকে তার বিশ্ববিখ্যাত 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' প্রকাশ করলেন। আমেরিকাতে নারী অধিকারের দামামা বেজে উঠল। এই বছরই আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে প্রথম 'উইম্যানস রাইটস কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হল। আমেরিকার নারীরা যখন তাদের অধিকার লাভের দাবিতে সোচ্চার, তখন ভারতের নারীসমাজ ছিল দাসত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। হিন্দুধর্ম নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাকে অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করেছে। হিন্দুধর্ম ঘোষণা করেছে নারীমাত্রেই শূদ্রাণী। তাদের শিক্ষা বা শাস্ত্র চর্চার কোন অধিকার নেই। পুরুষের দাসত্ব ও সেবা করাই তাদের বিধিলিপি।

১৮৪৮ সালে ভারতের নারীসমাজের কাছেও একটি নবযুগের সন্ধিক্ষণ। এই বছরের প্রথম দিকে জ্যোতিরাও ফুলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীদের শিক্ষার জন্য একটা স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি মনে করতেন যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আগে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। কারণ নারী হচ্ছে মাতৃজাতি। মায়ের নিকট থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রথম শিক্ষালাভ করে থাকে। কাজেই মা শিক্ষিতা হলে শিশুরা মায়ের কাছ থেকে ঘরে বসেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে। জ্যোতিরাও-এর সংগ্রামের অন্যতম সাথী ও আবাল্য বন্ধু সদাশিব গোবান্দে তখন আমেদ-নগরে বিচারকের অফিসে চাকুরীরত। মেয়েদের স্কুল খোলার বিষয় গোবান্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য জ্যোতিরাও আমেদনগর গেলেন। ঐ সময় আমেদনগরে অনেক মিশনারী স্কুল ছিল। মিস্ ফারার আমেরিকান মিশনের মেয়েদের স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। জ্যোতিরাও এবং তাঁর বন্ধু মিস্ ফারারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ভারতের নারীসমাজের অশেষ দুর্গতির জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। জ্যোতিরাও-এর নারীদের জন্য স্কুল খোলার প্রস্তাব শুনে তিনি তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন।

পুনাতে ফিরে এসে জ্যোতিরাও ১৮৪৮ সালের আগস্ট মাসে ভারতের নিম্নবর্ণের নারীদের জন্য প্রথম স্কুল সুরু করেন। এ কাজে তিনি তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে বেশ কিছুকাল ধরে ট্রেনিং দেন এবং সাবিত্রীবাঈ ঐ স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে কাজ সুরু করেন।

সাবিত্রীবাঈ ফুলেই ভারতের প্রথম নারী শিক্ষিকা। কিন্তু এই কাজ তিনি এত সহজে করতে পারে নি। যে সমাজে নারীর শিক্ষার অধিকার নেই, সেই সমাজে একজন নারী শিক্ষিকার কাজ করবে—এটা কি গোঁড়া হিন্দুরা মেনে নিতে পারে? তারা প্রথমে সাবিত্রীবাঈকে শিক্ষিকার কাজ বন্ধ করতে জ্যোতিরাওকে সতর্ক করে। জ্যোতিরাও তাদের কথায় কর্ণপাত না করাতে তারা গোবিন্দরাও-এর কাছে অভিযোগ জানায় এবং তাকে হুমকি দেয় যে, যদি তার পুত্রবধূ বেহায়া খৃষ্টান মেয়েদের মত স্কুলে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দান করে, তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে।

তিনি ভীত হয়ে সাবিত্রীবাঈ-এর শিক্ষিকার কাজ বন্ধ করতে জ্যোতিরাওকে নির্দেশ দেন। তিনি এও জানালেন যে, যদি সাবিত্রীবাঈ স্কুলের কাজ বন্ধ না করে, তবে তার পক্ষে পুত্রবধূকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না।

নারীশিক্ষা জ্যোতিরাও-এর কাছে ছিল আদর্শের ব্যাপার। তাই আদর্শের খাতিরে জ্যোতিরাও পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। তবু তিনি আদর্শ থেকে এক পদও বিচ্যুত হলেন না। পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত করেও যখন গোঁড়া ব্রাহ্মণরা স্কুল বন্ধ করতে পারল না, তখন তারা স্কুলে যাতায়াত পথে সাবিত্রীবাঈকে গালাগালি, ভীতি প্রদর্শন, এমন কি তাঁর প্রতি ঢিল পর্যন্ত ছুড়তে থাকে। সাবিত্রীবাঈ সব অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে আপন কর্তব্য করে চলেন। ভারতের নারী শিক্ষার ইতিহাসে সাবিত্রীবাঈ ফুলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আজ বোম্বাই শহরে সবচেয়ে বিখ্যাত মহিলা কলেজের নাম 'সাবিত্রীবাঈ ফুলে কলেজ'। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা বিরোধিতা করলেও জ্যোতিরাওকে মেয়েদের স্কুল চালাতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন তাঁর দুই ব্রাহ্মণ বন্ধু গোবান্দে ও বলবেকর। তাদের সহায়তায় জ্যোতিরাও ১৮৫১ ও ১৮৫২ সালে আরো দুটি মেয়েদের স্কুল চালু করেন।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে গোঁড়া হিন্দুসমাজের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। বলা হত যে নারী লেখাপড়া শিখবে, তার স্বামীর অকাল মৃত্যু হবে এবং সে বিধবা হবে। যে পরিবারের মেয়ে শিক্ষালাভ করবে, সে পরিবার সমাজে অপবিত্র ও কলঙ্কিত হবে। যে নারী শিক্ষালাভ করবে, সে কুলত্যাগিনী হবে এবং পরিবারের কলঙ্কভাজন হবে। নারী যদি জুতা বা চটি পরিধান করে, তা হবে পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। নারীর ছাতা ব্যবহার পুরুষদের পক্ষে ঘোর অবমাননাকর। বয়স্ক লোকদের সামনে অল্প বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন অশালীন আচরণ ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দুসমাজে নারীদের জীবনে ছিল এরূপ অসংখ্য বিধিনিষেধ। গোঁড়া হিন্দুরা বুঝতে পেরেছিল যে, নারী যদি শিক্ষালাভ করে তবে তাকে বেশীদিন

দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যাবে না। তাই তারা নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিল।

আমাদের বাঙলাদেশের গোঁড়া হিন্দুরাও ছিল নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন রামমোহন-বিদ্যাসাগররা নারীশিক্ষার প্রচলন সুরু করেন তখনও তাঁদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করা হত। গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিনিধি স্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি ব্যঙ্গ কবিতার দুটি লাইন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

ছুড়িগুলি তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলিতি বোল কবেই কবে॥

ভারতে নারী শিক্ষার ইতিহাসে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতায় ১৮১৯ সালে। এরপর বোম্বাইতে আমেরিকার খৃষ্টান মিশনারীরা প্রথম মেয়েদের স্কুল সুরু করে ১৮২৪ সালে। পুনাতে প্রথম আমেরিকান মিশনারীরা মেয়েদের জন্য স্কুল সুরু করে ১৮৪০ সালে। ফুলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় হল নিম্নবর্ণের মেয়েদের জন্য নিম্নবর্ণের মানুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুল এবং এই স্কুলের শিক্ষিকা সাবিত্রীবাঈ ফুলে হলেন ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা।

পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর জ্যোতিরাও যখন স্কুল করার মত গৃহ কোথাও পেলেন না তখন তাঁর বন্ধু সদাশিব গোবান্দে তাঁকে পুনার জুনাগঞ্জ পেঠে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাসে ২ টাকা করে অনুদান দিতে থাকেন। গোবান্দে ছাড়াও গোবান্দের চেষ্টায় আরো কতিপয় ব্রাহ্মণ জ্যোতিরাওকে স্কুল চালাতে সাহায্য করেছিলেন। নিম্নবর্ণের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও বইপত্র স্কুল থেকে দেওয়া হত। সাধারণের জলাশয় ও কুয়া থেকে স্কুলের নিম্নবর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের জল খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ফলে জ্যোতিরাওকে অর্থব্যয় করে স্কুলে জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। যখন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন নূতন স্কুল গৃহের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সময় একজন সহৃদয় মুসলমান শিক্ষানুরাগী

তার নিজ খরচে একটা নূতন স্কুল গৃহের ব্যবস্থা করে দেন। একথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, বিগত ৩ হাজার বছরের মধ্যে সারাভারতে সমাজের নীচুতলার মানুষদের জন্য প্রথম শিক্ষার দ্বার মুক্ত করলেন মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরাও-এর সমসাময়িক বাংলা দেশের শিক্ষার বিস্তারের কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, তৎকালের শিক্ষাদরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃটিশ সরকারকে এক রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এই ছিল বাংলার প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ শিক্ষাবিদদের চরিত্র।

১৮৫০ সালের জুলাই মাসে জ্যোতিরাও পুনার বুদ্ধবার পেঠে আন্নাসাহেব চিপলুঙ্করের বাড়ীতে মেয়েদের জন্য আরো একটি স্কুল করেন। প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে এই স্কুলটি পরিচালনায় দায়িত্ব নেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। প্রধান শিক্ষিকা হলেও তিনি সেজন্য কোন বেতন নিতেন না। এই স্কুলটিতে জ্যোতিরাও প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে 'ফ্রি সারভিস' দিতেন। আন্নাসাহেব ছিলেন একজন ধনবান ব্যক্তি এবং কেশবরাও ভবলকরের বন্ধু। জ্যোতিরাও-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভবলকরের চেষ্টাতেই এই নূতন স্কুলটি চালু করা সম্ভব হয়েছিল। এই স্কুলটি প্রথমে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে সুরু করা হলেও কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮ জনে। জ্যোতিরাও নারীশিক্ষার জন্য 'ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেছিলেন। এই সোসাইটির তত্ত্বাবধানে তিনি মাত্র ৩ মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে পুনার রাস্তা পেঠে এবং ১৮৫২ সালের মার্চ মাস পুনার বেতানা পেঠে আরো দুটি মেয়েদের স্কুল খোলেন।

মহারাষ্ট্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। ছত্রপতি শিবাজী ১৬৭৪ সালের তার রাজ্যাভিষেকের বছরে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের 'দক্ষিণা' নামে প্রতি শ্রাবণ মাসে একটা বিশেষ দানের প্রথা প্রচলন করেন। এই প্রথাটি তার পুত্র শম্ভাজী ও রাজারাম এবং পরবর্তীকালে শাহু, ১ম রাজীরাও, পেশোয়া মাধবরাও এবং ২য় বাজীরাও বজায় রাখেন। প্রতি বছর

সংস্কৃত ভাষা চর্চাকারী ব্রাহ্মণগণ এই দক্ষিণা পেতেন। এজন্য রাজকোষ হতে ৪/৫ কোটি টাকা ব্যয় হত।

১৮৪০ সালে যখন বৃটিশ সরকার মহারাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করল, তখন তারা দেখল যে দক্ষিণার নামে হাজার হাজার অকর্মণ্য ব্রাহ্মণ সরকারী তহবিল থেকে টাকা পাচ্ছে, যাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকারই হয় না। তখন তারা এই বাজে খরচটা কমাবার কথা ভাবল। ১৮৪৯ সালে গোপালরাও দেশমুখ সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব দিলেন যে, উক্ত 'দক্ষিণা' ফান্ড থেকে অর্ধেক টাকা যারা মারাঠী ভাষায় ভাল বই লিখেছেন তাদের পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হোক। আন্নাসাহেব চিপলুঙ্কর এবং কেশবরাও ভবলকর সহ বহু সমাজ সংস্কারক এই প্রস্তাব সমর্থন এবং প্রস্তাবে স্বাক্ষর দান করেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ এই প্রস্তাবে ক্ষেপে যায় এবং প্রস্তাবকারীদের উপর হামলা করার ভীতি প্রদর্শন করে। উদ্যোক্তরা তখন জ্যোতিরাও-এর কাছে যান। জ্যোতিরাও তাঁর সমর্থক কয়েক শত মাহার ও মঙ্ যুবকদের নিয়ে উক্ত প্রস্তাব মিছিল করে নিয়ে গিয়ে সরকারের কাছে পেশ করেন।

ফলে 'দক্ষিণা ফান্ড' থেকে অর্ধেক টাকা মারাঠী চর্চার জন্য উৎসাহ দান করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই ফান্ড থেকে নূতন মারাঠী স্কুলের জন্যও সাহায্য করা হত। জ্যোতিরাও প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহও এই ফান্ড থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছে।

জ্যোতিরাও ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে যেমন দিনের বেলায় স্কুল চালাতেন তেমনি যারা সারাদিন কাজ করত তাদের জন্য রাত্রিবেলায় নিজের বাড়ীতে স্কুল খোলেন। এই স্কুলে বয়স্ক কৃষক ও তাদের স্ত্রীরা বিনা বেতনে ২ ঘণ্টা করে পড়তে পারত। জ্যোতিরাও এবং সাবিত্রীবাঈ হাসি মুখে কঠোর পরিশ্রমে এই কাজ করতেন।

এই সময় জ্যোতিরাও ১৮৫৫ সালে 'তৃতীয় রত্ন' নামে একখানি নাটক লেখেন। উক্ত নাটকে তিনি দেখান যে, দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষক এবং তাদের পরিবারের মেয়েদের মিথ্যা দেবদেবীর ভয় দেখিয়ে নানা অনুষ্ঠানের নাম করে ব্রাহ্মণরা তাদের নিকট থেকে

অর্থ, ভোজ্য ও বস্ত্রাদি ঠকিয়ে নিচ্ছে। এই নাটকে শেষে এই সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয় যে, মানুষের কল্যাণে দেবদেবীর কোন হাত নেই। তাই তাদের পূজা করা নিরর্থক। যথার্থ জ্ঞান লাভের দ্বারাই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

এই সময় জ্যোতিরাও তাঁর পরিচালিত স্কুলগুলির খরচ চালাবার জন্য কিছুকাল খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎকালে কেউ হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামী সম্পর্কে সমালোচনা করলে গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ তাকে খৃষ্টান নামে অভিহিত করত। জ্যোতিরাও যেহেতু সর্বদা হিন্দুধর্মের কুসংস্কার এবং ব্রাহ্মণদের শোষণের কলাকৌশল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করাতেন, সেহেতু ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর সর্বদা খড়্গহস্ত ছিল। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা তাঁর নামে নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করত।

হত্যার ষড়যন্ত্র

বাড়ী থেকে বিতাড়িত এবং পিতার সংসার থেকে আলাদা করেও যখন জ্যোতিরাওকে তাঁর কর্তব্য থেকে টলান গেল না, তখন গোঁড়া ব্রাহ্মণরা তাঁকে জগৎ থেকে সরিয়ে দেবার এক ষড়যন্ত্র করে। তারা পুনার নিম্নবর্ণের দুজন যুবককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে খুন করার জন্য গভীর রাত্রে তাঁর বাড়ীতে পাঠায়। একজনের নাম রামোজি সম্প্রদায়ের রোডে। অন্যজন কুম্ভার সম্প্রদায়ের ধোণ্ডিরাম নামদেও। তারা উভয়ে গভীর রাত্রে অন্ধকারে জ্যোতিরাও-এর বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাদের হাতে ছিল বড় ধরনের তীক্ষ্ন ছুরি। জ্যোতিরাও নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ওদের ফিসফিস কথাবার্তা এবং চাপা পদশব্দে জ্যোতিরাও-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন এবং ঘরের অস্পষ্ট আলোতে দুটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। জ্যোতিরাও তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কে'? মাথার কাছে 'ডীম' করে রাখা আলো বাড়িয়ে দিলে জ্যোতিরাও দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ইতিমধ্যে সাবিত্রীবাঈ-এর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।

তখন রামোজী জ্যোতিরাওকে বলল, 'আমরা তোমাকে খুন করতে এসেছি?'

জ্যোতিরাও অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কেন তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ? আমিত তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি?'

তখন একজন বলল—'তুমি আমাদের কোন ক্ষতি কর নি ঠিক; কিন্তু কিছু লোক তোমাকে খুন করতে বলেছে। তোমাকে খুন করলে আমরা এক হাজার করে টাকা পাব।'

তখন জ্যোতিরাও তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন আমার জীবন গরীবদের জন্য উৎসর্গীকৃত। তোমরা গরীব। আমার জীবনের পরিবর্তে যদি তোমরা ১ হাজার করে টাকা পাও, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে।

একথা শুনে তাদের চোখ জলের ধারা নেমে আসে। তারা

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাও-এর পদতলে পতিত হয়ে বারবার ক্ষমা চাইল এবং বলল, 'আদেশ করুন যারা আপনার মত দেবতুল্য ব্যক্তিকে আমাদের খুন করতে পাঠিয়েছে, তাদের আমরা এখনই ভবধাম থেকে সরিয়ে দিয়ে আসি।'

জ্যোতিরাও বললে, 'তারা আমাকে ঠিকমত জানে না; তাই ভুল করে তোমাদের আমাকে খুন করতে পাঠিয়েছে। আমি চাই তারা দীর্ঘজীবী হোক।' জ্যোতিরাও জানতেন ক্ষমাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ গ্রহণ।

এরপর তারা দুজনেই জ্যোতিরাও-এর একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে গেল। তারা পরদিন থেকে জ্যোতিরাও-এর নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপাড়া শিখতে সুরু করে। মঙ রামোশী হল জ্যোতিরাও-এর দেহরক্ষী এবং কুম্ভারে ধোঁডরাম মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া শিখে একজন পণ্ডিত হয়ে জ্যোতিরাও-এর প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক সমাজের উৎসাহী প্রচারক হন এবং পরবর্তী কালে সত্যশোধক সমাজের আদর্শ প্রচারকল্প বেশ কয়েকখানি পুস্তকও তিনি লিখেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে জ্যোতিরাও

১৮৫৭ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী বছর। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই বছর ১০ মে থেকে সুরু হল ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ পুনার ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুনরায় পেশোয়ারাজ কায়েমের আশা জাগিয়ে তুলল। তাদের মধ্যে অনেকে ভাবল এবার বৃটিশ-রাজত্ব শেষ হতে চলেছ; সুতরাং তারা নূতন করে ব্রাহ্মণরাজ কায়েম করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী সালার জঙ্গের সমর্থন, শিখদের নিষ্ক্রিয়তা এবং নেপালীদের পূর্ণ সমর্থনে সিপাহী বিদ্রোহের কবল থেকে বৃটিশ-রাজত্ব রক্ষা পায়।

জ্যোতিরাও বুঝতে পেরেছিলেন, হিন্দুরা বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে লড়াইতে জিততে পারবে না। জাতব্যবস্থা হিন্দু একতাকে খান খান করে দিয়েছে। তারপর হিন্দুরাজত্বের অর্থ হল ব্রাহ্মণ রাজত্ব। ব্রাহ্মণদের রাজত্বের অর্থ হল শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের ক্রীতদাসত্ব। জ্যোতিরাও ছিলেন ব্রাহ্মণদের ক্রীতদাসত্বের ঘোর বিরোধী এবং শূদ্র সমাজের স্বাধীনতার প্রতীক। সেহেতু তিনি সিপাহী বিদ্রোহকে কোন প্রকার সমর্থন জানান নি। তৎসত্ত্বেও বৃটিশরা তাকে সন্দেহ করতে থাকে। ফলে তিনি এই সময় ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল করে দিয়েছিলেন। নানা-সাহেবের পরাজয়ে তিনি মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নানাসাহেবের জয়লাভ মানেই ব্রাহ্মণ্যরাজ কায়েম অর্থাৎ পুনরায় মনুর শাসন ফিরে আসা। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

"আজ বৃটিশ শাসন আছে, কাল হয়ত তা থাকবে না। তবে যতদিন বৃটিশ-শাসন বহাল আছে ততদিন হিন্দুসমাজের নীচুতলার মানুষ যারা হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছে, তারা শিক্ষার আলো পাবে এবং মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে ওঠার সুযোগ পাবে।"

জ্যোতিরাও এর এই মন্তব্যটি যে ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ

এতে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক জি. পি. আগরকর বলেছিলেন—

"ভারতের শূদ্র ও অস্পৃশ্য সমাজের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল বলেই নানাসাহেব পেশোয়ার বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।"

সিপাহী বিদ্রোহের পরোক্ষ প্রভাবে শূদ্রসমাজ ও নিম্নবর্ণের মানুষদের উন্নতির সম্ভাবনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এর ফলে জ্যোতিরাও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজ ও মিশনারীদের দান ও সহায়তার উৎসাহ অনেকটা কমে গিয়েছিল এবং জ্যোতিরাও এর উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা কমিটিতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যবৃদ্ধির ফলে স্কুলগুলিতে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে এবং উচ্চবর্ণের ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে জ্যোতিরাও তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহের প্রতি পূর্বের উৎসাহ অনেকটা হারিয়ে ফেলেন। এরপর জ্যোতিরাও-এর দৃষ্টি হিন্দুসমাজের বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

বিধবা বিবাহ ও অনাথ আশ্রম

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্বভারতে দুজন ব্রাহ্মণ সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এবং দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের নিয়ে আন্দোলন করে হিন্দুসমাজে দারুণ সোরগোল তুলে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু-বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে সতী করার বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার সমর্থনে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে লর্ড বেণ্টিক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা আইনতঃ রদ করা হয় এবং বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালের ২৫শে জুলাই বিধবা বিবাহের আইন ভারত সরকার কর্তৃক পাশ হয়। ফলে সারা ভারতব্যাপী বিধবা বিবাহ নিয়া মনুবাদের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই আন্দোলনের ঢেউ মহারাষ্ট্রে পৌঁছে যায়। ১৯৪০ সালে বিষ্ণুশাস্ত্রী বাপত বিধবা বিবাহের সপক্ষে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে পুনাতে সোরগোল তুলে দিলেন। ১৮৪২ সালে বেলগাঁওতে দুজন ব্রাহ্মণ বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হন। ১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাইএর জেনারেল এসেম্বলি ইনসটিটিউটে প্রগতিশীল হিন্দু নেতাদের বিধবা বিবাহের সমর্থনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভবানী বিশ্বনাথ। এই সম্মেলনে গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ-ভাবে যোগদান করে সভা ভণ্ডুল করে দেয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে সরকারী আইন পাশ হলে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালে বাবা পদ্মনজী 'যমুনা পর্যটন' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন, যাতে বিধবাদের দুঃখ দুর্দশার কথা অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাষায় ব্যক্ত করা হয়।

স্বভাবতই জ্যোতিরাও-এর মত সমাজ সংস্কারক বিধবা বিবাহ আন্দোলনের একজন সোচ্চার সমর্থক ছিলেন। 'বিধবা বিবাহ' সমস্যাটি ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে তীব্রতর হলেও অন্যান্য হিন্দু-

সমাজের উপরও তার প্রভাব কম ছিল না। জ্যোতিরাও শুধু বিবাহের সমর্থন করে ক্ষান্ত হন নি; তিনি বিধবাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কাজ শুরু করলেন। জ্যোতিরাও বক্তৃতার চেয়ে কাজ করা বেশী পছন্দ করতেন। তিনি দেখলেন যে, অনেক বিধবা পুরুষদের নানা প্রকার প্রলোভনে বিপথগামী হয়ে শেষ পর্যন্ত গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন তাদের গোপনে অকালে গর্ভপাত করতে হয়; অথবা সদ্যোজাত শিশুদের রাতের অন্ধকারে পথেঘাটে ফেলে দিতে হয়; অথবা সদ্যোজাত নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করতে হয়। এই সব পাপকার্য থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য জ্যোতিরাও তার নিজের বাড়ীতে একটি অনাথ আশ্রম খোলেন, যেখানে গর্ভবতী বিধবারা আশ্রয় পেত এবং সন্তান প্রসবের পর তারা ইচ্ছানুসারে সন্তানকে আশ্রমে রেখে যেতে পারত। আশ্রম থেকে শিশুদের সযত্নে লালন পালন করে মানুষ করা হত। ফলে বিধবারা ভ্রূণ হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেল।

জ্যোতিরাও নিঃসন্তান ছিলেন। সাবিত্রীবাঈ এই সব শিশুদের নিজের সন্তানের মত যত্নসহকারে লালন পালন করতেন। অনেক বিধবারা এই আশ্রমে না থেকেও গোপনে এসে সন্তান প্রসব করে রেখে যেত। এই সব কাজ করার ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা জ্যোতি-রাওকে মহাপাপাচারী বলে সর্বদা গালাগাল দিত। জ্যোতিরাও প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমটি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম অনাথ আশ্রম। হিন্দু সমাজে আর কোথাও তখন এই ধরণের আশ্রম দেখা যায় নি। পরবর্তী কালে এই ধরনের আশ্রম ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্র গড়ে উঠেছে। এদিক থেকে জ্যোতিরাওকে হিন্দু সমাজে প্রথম অনাথ আশ্রমের প্রবর্তকও বলা চলে।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, বাল্যবিবাহের ফলেই বালবিধবাদের সৃষ্টি। মেয়েদের যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় তাহলে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা প্রয়োজন। তাই মেয়েদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। সাবালিকা হওয়ার পর বিবাহ হলে বিধবা বিবাহের সমস্যাটিও যথেষ্ট পরিমানে কমে যাবে। এই বিষয়টিও ছিল হিন্দু সমাজ সংস্কারের মস্ত বড়

দিক—যে ব্যাপারে জ্যোতিরাও-এর ভূমিকাটিও নিতান্ত কম ছিল না।

এই সময় জ্যোতিরাও এর পিতা গোবিন্দারাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্যোতিরাও এর বড় ভাই রাজারাম বাবার সঙ্গেই থাকতেন। জ্যোতিরাও এর কোন সন্তানাদি না হওয়ার জন্য তাঁর পিতা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ অসুস্থ হওয়ার পর এই চিন্তাটি আরো বেড়ে যায়। তিনি তাঁর বেয়াই অর্থাৎ জ্যোতিরাও এর শ্বশুরকে ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করলে জ্যোতিরাও-এর শ্বশুর-বাড়ী থেকে প্রস্তাব আসে যাতে জ্যোতিরাও পুনরায় বিয়ে করে বংশরক্ষার প্রতি মনোসংযোগ করেন। জ্যোতিরাও এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন না। তিনি জানালেন, এটাও হতে পারে যে তাঁর জন্যই তাদের সন্তানাদি হচ্ছে না। সুতরাং পুনরায় বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষতঃ তিনি মনে করতেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অর্থ প্রথম পত্নীর প্রতি অবমাননা করা। আত্মসম্মানের জন্য যিনি আজীবন লড়াই করছেন, স্ত্রীর আত্ম-সম্মান খর্ব করার কোন অধিকারই তাঁর নেই।

অল্পকাল পরেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ব্রাহ্মণ শাস্ত্র মতে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করেন নাই। তৎকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে কাক-ভোজনের রীতি প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ-দের ভুরিভোজন এবং নানা প্রকার সামগ্রী দান করতে হত। পিতার মৃত্যুতে তিনি কোন ব্রাহ্মণকে ডাকেন নি। তিনি উক্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও অনাথ ব্যাক্তিদের তৃপ্তি সহকারে খাওয়ান এবং দরিদ্র ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের পুস্তক দান করেন।

পিতার মৃত্যুর পর পিতার যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি থাকলেও সে বিষয়ে তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি মনে করতেন, দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ছেলেমেয়েরা। তাঁর প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। অর্থকে তিনি সম্পদ বলে মনে করতেন না। অর্থ ছিল তাঁর কাছে কর্মের সাধন মাত্র। অর্থ সম্পর্কে তিনি সর্বদা তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব এবং দরদী মানুষদের পর্যাপ্ত সহায়তা পেয়েছেন। অর্থের

অভাবে তাঁর কোন সংকল্প কখনো ব্যর্থ হয় নি। তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা ছিল খুবই সামান্য। তা তিনি নিজে পরিশ্রম করেই যোগাড় করতেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি। তাঁর যোগাযোগ এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাদের কল্যাণ ও স্বাধিকার লাভ।

———

ব্রাহ্মণ্যবাদের রহস্যোদ্ঘাটন

ধনলাভের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও তাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাপন এবং যে সব সমাজ সংস্কারমূলক কাজ এবং পুস্তক প্রণয়ন তিনি করেছিলেন এজন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সরকারী চাকুরী গ্রহণ ছিল তাঁর আদর্শ বিরোধী। তাঁর শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে তিনি সরকারী উচ্চপদে সহজে আসীন হতে পারতেন ; তথাপি স্বাধীনচেতা জ্যোতিরাও সেদিকে যান নি। জ্যোতিরাও তখন সরবরাহ ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। এই সময় সরকারের পক্ষ থেকে পুনার 'খাদকওয়ালাতে' একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছিল। জ্যোতিরাও সেখানে পাথর সরবরাহের জন্য ঠিকাদারীর কাজ নেন।

এই কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে তিনি একটা নূতন জগতের পরিচয় পেলেন। সেই জগৎটি হল সরকারকে ঠকাবার, শ্রমজীবী মানুষদের বঞ্চনা করার এবং পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির কলাকৌশলের জগৎ। সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ জ্যোতিরাও এই জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটি হল এই প্রবঞ্চনাময় জগতের কুশীলবরা সকলেই হলেন মর্তের দেবতা-নামধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুল। এতকাল তিনি ব্রাহ্মণদের সামাজিক শোষণের হাতিয়ারগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবার সরকারী ঠিকাদারের কাজ করতে এসে সরকারী অর্থ তছরূপ করা এবং শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণের কারবারে ব্রাহ্মণদের অসীম দক্ষতার প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্রাহ্মণরা হল হিন্দু সমাজের নৈতিকতাবিহীন দুর্নীতিপরায়ণ একটা দুষ্টচক্র। ব্রাহ্মণ সমাজের বিবেকবান ও সৎ অংশ শতকরা পাঁচভাগও নয়। ব্রাহ্মণ সমাজে সৎ এবং বিবেকবান মানুষদের ব্যতিক্রম বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের আদর্শে বিশ্বাসী জ্যোতিরাও ঠিকাদারের কাজ করতে এসে দেখতে পেলেন যে, সরকারের বাস্তুবিভাগে (Public Works Department) শ্রমিক ব্যতীত ইঞ্জিনীয়ার থেকে পিওন পর্যন্ত সবই ছিল ব্রাহ্মণ সমাজের

লোক। কারণ সে সময় শিক্ষিত শ্রেণী বলতে ব্রাহ্মণদেরই বোঝাত। অব্রাহ্মণ সমাজ তখন সবেমাত্র লেখাপড়া শিখতে সুরু করেছে। তাই সরকারী চাকুরীতে অব্রাহ্মণরা একেবারেই নগণ্য ছিল। দু'চারজন যারা ছিলেন তারাও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন। ফলে সরকারী অফিসে ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া রাজত্ব।

ঠিকাদারের কাজ করতে গিয়ে জ্যোতিরাওকে বাস্তু বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা থেকে ইঞ্জিনীয়ার ও কেরানী পর্যন্ত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। ফলে তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজকর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি দেখলেন, ইঞ্জিনীয়াররা অফিস কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসে মিথ্যা ভাউচার তৈরী করে বিপুল পরিমান অর্থ আত্মসাৎ করছে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তাদের উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে তাদের নিকট থেকে বিল সই করিয়ে নিচ্ছে। আর নীচের দিকের দিনমজুরদের নানা অজুহাতে কম পয়সা দিয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বঞ্চনা দেখে জ্যোতিরাও-এর ব্রাহ্মণদের প্রতি যে বিরাগ জন্মেছিল সরকারী চাকুরীতে তাদের দুর্নীতির বহর দেখে তাঁর অভিজ্ঞতার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

ঠিকাদারীর কাজে জ্যোতিরাও যথেষ্ট অবসর পেতেন। এই অবসর সময়ে তিনি সরকারী রিপোর্ট, ইতিহাস, মারাঠী সন্ত কবিদের গ্রন্থ এবং মিশনারীদের রচিত বইপত্র পাঠ করতে লাগলেন। গ্রন্থাদি পাঠ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করল।

এই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় তুকারাম তত্য পদ্মলের। তিনি একাধারে সমাজ-সংস্কারক এবং লেখক ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ভাণ্ডারী। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং তার কুফল সম্পর্কে একখানি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটির নাম 'জাতিভেদ বিবেকসার, (রিফ্লেকশান অন দি ইনসটিটুট অব কাস্ট)। তুকারাম ছিলেন সমাজবিপ্লবী। তাঁর এই গ্রন্থটিতে তিনি জাতব্যবস্থা সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণদের স্বার্থান্বেষী হীন কলাকৌশলের রহস্যটি চমৎকারভাবে উদ্ঘাটন করেছিলেন। বইটি তিনি বেনামীতে প্রকাশ করেন।

বইটি পরবর্তীকালে কেউ প্রকাশ করতে সাহসী না হলে দুঃসাহসী জ্যোতিরাও প্রকাশক হয়ে ১৮৬৫ সালে বইটি প্রকাশ করলেন। বইটি প্রকাশের পর ব্রাহ্মণকুল জ্যোতিরাও-এর উপর আরো খেপে যায়।

জ্যোতিরাও বক্তৃতার চেয়ে কাজ করা বেশী পছন্দ করতেন। অস্পৃশ্য বা অতিশূদ্রদের প্রতি তাঁর দরদ এবং ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। তিনি তাঁর বাড়ীর কুয়া অস্পৃশ্যদের ব্যবহার করার জন্য মুক্ত করে দিলেন। তাঁর এরূপ কাজে উচ্চবর্ণের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। অস্পৃশ্যদের অধিকারের জন্য বক্তৃতা করা এক কথা, আর তাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে কুয়া থেকে জল নিতে বলা অন্য কথা। এই কাজ তখন পর্যন্ত কোন সমাজ সংস্কারক করতে সাহসী হন নি। ফলে এই কাজের জন্য জ্যোতি-রাও-এর নিজের জাতের লোকেরাও তাকে জাতিচ্যুত করার ভয় দেখালেন। কিন্তু জ্যোতিরাও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

জ্যোতিরাও প্রশ্ন তুললেন—যে সব ব্রাহ্মণেরা মাহারদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে, সেই সব ব্রাহ্মণরাই খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের বন্ধু বলে নিজেরা গর্ব প্রকাশ করে। তাহলে এই সব ব্রাহ্মণরা নিজেদের কি করে ধর্মপরায়ণ বলে দাবি করতে পারে?

জ্যোতিরাও ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি যা বলতেন তা তিনি মনে প্রাণে পালন করতেন। এই ধরণের মানুষ সর্বসমাজ সর্বদেশে খুবই বিরল। এরাই যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। জ্যোতিরাও ছিলেন দরিদ্র, সৎ, সাহসী, নির্ভীক, নিস্বার্থ এবং দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের সেবার উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

তাঁর বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্মণরা ছিল ধনবান, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, সুকৌশলী এবং সংঘবদ্ধ। জ্যোতিরাও ছিলেন জ্ঞানবান এবং সত্য ও মানবতার পূজারী। কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সমর্থক। এই বন্ধুদের সমর্থনে তিনি অকুতোভয়ে লড়াই ঘোষণা করেছিলেন বিপুলসংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদী, সুচতুর ও সুকৌশলী গোঁড়া ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং অনেক ক্ষেত্রে যে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর এই সাফল্য মহারাষ্ট্রে নবযুগের সূচনাতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

———

লেখক জ্যোতিরাও

এই সময় থেকে সুরু হল জ্যোতিরাও-এর ভাবনাচিন্তার লিখিত বিবরণ। এতদিন তিনি বক্তৃতা করেছেন এবং কাজ করেছেন। এবার তিনি লেখনী ধারণ করলেন। দেখা গেল বক্তৃতার চেয়ে তাঁর লেখনী আরো বেশী শক্তিশালী এবং আরো বেশ যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর রচনার বেশীর ভাগই ছিল ছন্দোবদ্ধ কাব্যে। গদ্যও তিনি কিছু লিখেছেন। তবে গদ্যের চেয়ে পদ্যে তাঁর দক্ষতা ও মুন্সিয়ানা বেশী প্রকাশিত হয়েছে।

কেবল মাত্র সমাজসংস্কার নয়, দেশপ্রেম যে তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ব্যালাড অন ছত্রপতি শিবাজী'তে। গ্রন্থটি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়েছিল রায়বাহাদুর রামচন্দ্র বালকৃষ্ণকে—যিনি ছিলেন পরমহংস সভার সভাপতি।

এই কাব্যগ্রন্থে তিনি শিবাজীকে দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনিই প্রথম মহারাষ্ট্রবাসীদের শিবাজীর দেশপ্রেমের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন। তিনি এই কাব্যগ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ও সুললিত ভাষায় বিদেশী মুসলমানদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে শিবাজীর স্বপ্নের কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। মাতা জিজাবাঈ-এর অনুপ্রেরণায় বালক শিবাজীর মনে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন জাগরিত হয়েছিল ; তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালে মাত্র কয়েকজন একনিষ্ঠ অনুগামীদের নিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি অপ্রতিম মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করে হিন্দুসাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন। তাই হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে জ্যোতিরাও শিবাজীকে অঙ্কিত করেন। শিবাজী ছিলেন অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শক্তির যথার্থ প্রতিনিধি। জ্যোতিরাও কত সুললিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় মুসলিম আক্রমণের বর্ণনা করেছিলেন তার একটু নমুনা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে উল্লেখ করা হল—যদিও বাংলা অনুবাদ কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচার পাঠকগণ করবেন।

"কাবুল ত্যাগ করে ঢুকে পড়ে সিন্ধু।
মুখে তাদের লম্বা দাড়ি, অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দু॥
টিকি কাটে বামুনদের, শিরচ্ছেদ করে।
ভেঙ্গে ফেলে শিবমূর্তি মন্দিরে মন্দিরে॥
গোমাংস ভোজনে পটু, শূকর নাহি খায়।
চিত্রকলা ভাস্কর্য যত ধ্বংস করে দেয়॥
মূল্যবান দেবমূর্তি কাবুল নিয়ে যায়।
মেরে-কেটে হিন্দুদের ধর্ম কেড়ে নেয়॥
রাজাদের বন্দী করে চামড়া ছাড়ায়।
মন্দির ভেঙ্গে সেথা মসজিদ বানায়॥"

এমনি ছিল জ্যোতিরাও এর বর্ণনার ঢঙ। ফলে বইটি তখন মহারাষ্ট্রের দেশপ্রেমী হিন্দুদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জ্যোতিরাওই প্রথম ব্যক্তি যিনি শিবাজীর শৌর্যবীর্যকে প্রকাশ করে মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে চাঙ্গা করেন।

ঐ একই সালে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে জ্যোতিরাও আরো একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটির নাম 'প্রিস্টক্রাফ্‌ট এক্সপোজড' অর্থাৎ 'পুরোহিতকলা উন্মোচন'। এই বইটিও কাব্যছন্দে রচিত হয়।

বইটিতে তিনি প্রশ্ন করেন যেহেতু ব্রাহ্মণরা চণ্ডালদের ভিক্ষা দেয় না, সেহেতু তারা কিভাবে শূদ্রদের নিকট থেকে ভিক্ষা নিতে পারে? ব্রাহ্মণরা কি কি ভাবে কৃষকদের প্রবঞ্চিত করছে তার নির্দশন স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, যখনই কোন কৃষকের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন ব্রাহ্মণ তার বাড়ীতে গিয়ে বলছে, এই সন্তান যাতে দীর্ঘজীবী হয় তজ্জন্য দেবতাদের খুশী করার জন্য অনুষ্ঠান করতে হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানে দান ও দক্ষিণা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রীতিকর ভোজনের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই ভাবে কোন শিশুর জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণদের শোষণ সুরু হয়। হিন্দুসমাজের বিবাহ ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত-দের শোষণের একটি চমৎকার ব্যবস্থা। তিনি বলেন, বিবাহে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কোন প্রয়োজন নেই। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের নিকট বর-কনের ভবিষ্যৎ সুখময় জীবনের প্রার্থনা করে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে।

একাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে অহেতুক দান ও দক্ষিণা এবং আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই। আগেকার দিনে নাবালিকাদের বিবাহ হত। তাই তারা যখন সাবালিকা হত, তখন আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অনুষ্ঠান করা হত এবং পুরোহিতদের ডেকে তাদের উপাদেয় ভোজন ও দক্ষিণা দিতে হত। এভাবে এক বিবাহ উপলক্ষে দুবার কৃষকদের শোষণ করা হত।

নূতন বাড়ী তৈরী বা গৃহপ্রবেশ করতে হলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে অনুষ্ঠান করে তাদের ভোজন ও দক্ষিণা দেওয়ার প্রথাও ব্রাহ্মণদের শোষণের একটা কৌশল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বাড়ীতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তার আরোগ্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে দেবতাদের তুষ্ট করার প্রথাও ছিল ব্রাহ্মণদের শোষণের আর একটি কৌশল।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পারলৌকিক ক্রিয়ার নামে উক্ত পরিবারের নিকট থেকে নানা কৌশলে ধন ও অন্যান্য জিনিসপত্র দানস্বরূপ গ্রহণ এবং মৃতব্যক্তির স্বর্গলাভের প্রলোভনে তাদের সাধ্যাতীত ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের একটি চিরাচরিত কৌশল। শুধু তাই নয় পুরোহিতদের একটি অভিনব কৌশল হল, মৃতব্যক্তির মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান করে তার সন্তানদের বছরের পর বছর শোষণ করা। ধর্মের নামে এরূপ শত শত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কৃষকদের শোষণ করাই হল ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর চিরন্তন কৌশল।

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরো বলেছেন যে, ব্রাহ্মণরা ছিল শূদ্রদের শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তারা শূদ্রদের বেদপাঠ ও বেদপাঠ শ্রবণ কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে; অথচ তারা বিধর্মী খৃষ্টানদের বেদচর্চার জন্য গৌরব বোধ করছে এবং সাগ্রহে তাদের বেদপাঠ শিক্ষা দিচ্ছে। শূদ্ররা কেন নিরক্ষর, দরিদ্র এবং সমাজে নীচু বলে পরিগণিত তা আজ তাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষা ব্যতীত তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিদের শোষণ ও কলা-কৌশল অনুধাবন করতে পারবে না। শূদ্রদের উন্নতির চেষ্টা তাদের নিজেদের করতে হবে। নিজেদের উন্নতির জন্য তারা যদি ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভর করে, তবে মহা ভুল করবে।

জ্যোতিরাও লিখিত 'পুরোহিতকলা উন্মোচন' গ্রন্থটি সারা মহারাষ্ট্রের চিন্তাজগতে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। মহারাষ্ট্রের চিন্তাশীল মানুষ যারা পুরোহিত শ্রেণীর কলাকৌশল এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের দুর্দশার আসল রহস্য সম্পর্কে তেমন মনোযোগ দেন নি, তাদের কাছে এই গ্রন্থটি ভাবনা-চিন্তার একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল। একদিকে সমাজহিতৈষী দরদী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নূতন করে ভাবতে সুরু করলেন, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শোষণদুরস্ত পুরোহিতগণ তাদের কুকীর্তির বিবরণ এভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য জ্যোতিরাও-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করতে থাকে।

ফলে সমাজকল্যাণ সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষেরা যারা 'পরমহংস সভা' তৈরী করে কিছু কিছু সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন তাদের একটা অংশ নূতন করে সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং পুনাতে ১৮৭০ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর প্রার্থনা সভার শাখা গঠন করলেন। পরমহংস সভার সঙ্গে প্রার্থনাসভার মৌলিক পার্থক্য ছিল—পরমহংস সভার প্রধান কাজ ছিল সমাজসংস্কার; কিন্তু প্রার্থনা সভার প্রধান কাজ ছিল আধ্যাত্মিক সংস্কার অর্থাৎ তাদের কাজ ছিল ধর্মীয় ধ্যানধারণা সম্পর্কিত সংস্কার। ফলে জ্যোতিরাও-এর অনেক বন্ধু ও সমর্থক প্রার্থনা সভায় যোগদান করলেও জ্যোতিরাও এই সভায় যোগদান করেন নি। তিনি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কাজেই মগ্ন রইলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রের অন্যতম চিন্তানায়ক রানাডে পুনায় আসেন। তিনি যদিও প্রার্থনা সভার সমর্থক ছিলেন, তথাপি সমাজ সংস্কারকে যথেষ্ট গুরত্ব দিতেন। এজন্য তিনি জ্যোতিরাও-এর বাড়ীতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং সমাজসংস্কারমূলক কাজে জ্যোতিরাওকে সমর্থন ও সাহায্য করতে থাকেন। জ্যোতিরাও-এর সামাজিক সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের আন্দোলনকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে ও মুক্তহস্তে সাহায্য করেন।

গোলামগিরি

জ্যোতিরাও যেমন সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তেমনি তিনি তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরার কাজটিও বলিষ্ঠভাবে শুরু করেছিলেন ঊনবিংশ শতকে ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'গোলামগিরি'।

গ্রন্থটির নামপত্রে লেখা হল 'গোলামগিরি' (সুসভ্য বৃটিশ রাজত্বে জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে কর্তৃক উদ্ঘাটিত ব্রাহ্মণ্যবাদের নামে সামাজিক ক্রীতদাসত্ব)। বইটি ছাপা হয় 'পুনা সিটি প্রেস' থেকে। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহানুভব জনগণের' উদ্দেশ্যে—যারা নিগ্রোদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে নিরপেক্ষভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। লেখকের একান্ত কামনা যে, তাঁর দেশের মানুষেরা আমেরিকাবাসীদের মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতের শূদ্র সমাজকে ব্রাহ্মণদের ক্রীতদাসত্বের ফাঁস থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন।

গোলামগিরি গ্রন্থটি মারাঠী ভাষায় লেখা হলেও তার কিছু কিছু অংশ ইংরাজীতে লেখা হয়েছে। শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পি. জি. পাতিল গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা দপ্তর বইটি প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটিতে জ্যোতিরাও এবং তাঁর অন্যতম অনুগামী ধোণ্ডিবার কথোপকথন কাব্য ছন্দে এবং প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত। বইটির মূল্য ধার্য হয় ১২ আনা। তবে শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের জন্য ৬ আনা।

গোলামগিরি গ্রন্থটিতে জ্যোতিরাও-এর নিজের লেখা মুখবন্ধ ছাড়া মূলতঃ ১৬ টি অধ্যায় আছে। এতদ্ব্যতীত একটি গাঁথা ও ৩ টি কবিতা (অভং) সংযোজিত হয়েছে।

অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ—

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মা ও আর্যলোক

দ্বিতীয় অধ্যায়—মৎস্য এবং শঙ্খসুর

মুখবন্ধ

গোলামগির গ্রন্হের মুখবন্ধে সুরুতেই জ্যোতিরাও গ্রীসের মহাকবি হোমারের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'যেদিন মানুষ মানুষকে দাস বানাল, সেই দিনই তার মনুষ্যত্বের অর্ধেক বিলুপ্ত হল'।

সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন গবেষকগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে, ব্রাহ্মণশ্রেণী মূল ভারতবাসী নয়। মানবজাতিতত্ত্ববিদ ডঃ প্রিচার্ড বলেছেন, ব্রাহ্মণগণ মধ্য-এশিয়ার ইন্দো-ইউরোপীয়ান জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। তাদের অন্যান্য শাখা হল পারসিক, মীড, ইরাণী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী। ফলে সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসী,

জেন্দ প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। মধ্য এশিয়ায় তাদের বাসভূমি ছিল অনুর্বর ও পর্বতসঙ্কুল। সুতরাং তারা জীবন ধারণের উপযোগী উর্বর বাসভূমি খুঁজতে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ে এবং কলোনী তৈরী করতে থাকে। তারা শান্তিপ্রিয় বসবাসকারী হিসাবে আসে নি। তারা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এবং প্রভুত্বকামী। তাই তারা যেখানে গেছে, সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে সেখানকার মূল অধিবাসীদের পরাভূত করে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। আর্য নামে কথিত এই ব্রাহ্মণ জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষের ভূমিপুত্রদের দানব, দৈত্য, দাস, দস্যু এবং ক্ষুদ্র বা শূদ্র (তুচ্ছার্থে) নামে অভিহিত করে। যারা ভারতের মূল অধিবাসীদের রক্ষক ছিল তাদের তারা রাক্ষস নামে অভিহিত করে। মূল অধিবাসীদের মধ্যে যারা ছিল সাহসী এবং বহিরাগত আর্য প্রভুত্বকে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল তাদের তারা মহা-অরি বা মাহার নামে এবং যারা ছিল তেজস্বী ও আপোষহীন তাদের তারা চন্ডাল নামে অভিহিত করে। এই সব বিষয় সম্পর্কিত ইতিহাস ব্রাহ্মণদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণসমূহ পাঠ করলে পাওয়া যায়। পুরাণ নামক গ্রন্থসমূহে দেব এবং দানব বা দৈত্য, সুর এবং অসুর, আর্যপুত্র এবং রাক্ষসদের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত আছে। সেখানে দেব, সুর ও আর্যপুত্রদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে এবং দানব-দৈত্য, অসুর ও রাক্ষসদের বিকটাকৃতি ও গর্হিত আচরণকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সবই বহিরাগত আর্য-ব্রাহ্মণকুলের আগ্রাসী কার্য-কলাপের সুললিত ইতিহাস।

বর্তমান যুগে যাকে হিন্দুশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়, যাতে দেবদ্বিজকে অত্যন্ত উচ্চমানের এবং পরম শ্রদ্ধেয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাতে দেব-দ্বিজের বহু মহিমান্বিত কার্যকলাপের কাহিনী কীর্তিত হয়েছে, সে সবই সুকৌশলী বুদ্ধি-জীবী ব্রাহ্মণশ্রেণীর স্বকপোল কল্পিত গালগল্প ছাড়া কিছু নয় বলে জ্যোতিরাও উল্লেখ করেছেন। এগুলি করা হয়েছে একটা সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে—যাতে ব্রাহ্মণদের সমাজে শ্রদ্ধেয় এবং

হিতৈষীরূপে চিহ্নিত করে তাদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সকলে অবনতমস্তকে স্বীকার করে নেয়।

এইসব উপবীতধারী আপাতনিরীহ ব্রাহ্মণকুল যে সেই সময় কিরূপ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল তার উদাহরণ স্বরূপ জ্যোতিরাও উল্লেখ করেন, যে বিগত ৩।৪ শতাব্দী ধরে ইউরোপের সভ্যনামধারী জাতিসমূহ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে কলোনী স্থাপন করে কিভাবে স্বাধীন রেড ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো ও ভারতবাসীদের উপর বর্বর অত্যচার ও নৃশংস আচরণ করেছে তা ইতিহাসে ও নানা সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে। জ্যোতিরাও তার গোলামগিরি গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন যে, হাজার বছরের আগেকার আর্য ব্রাহ্মণগণ যখন ভারতে তাদের আগ্রাসী কলোনীসমূহ স্থাপন করেছে, তখন তাদের নৃশংস কার্যকলাপ বর্তমান ইউরোপীয়ান কলোনীসমূহের বর্বর আচরণকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। তখনকার নৃশংস শয়তানেরা এখন দেবতা নামে হিন্দুসমাজে পূজা পাচ্ছে। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, বর্বর পরশুরাম যেরূপ নির্মমভাবে ক্ষত্রিয় পুরুষ-নারী-শিশুদের বার বার নির্মূল করেছে তা কল্পনা করাও কঠিন। সেই নৃশংস পরশুরামকে হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম ব্রহ্মা ও আর্যলোক। এই অধ্যায়ের শুরুতেই জ্যোতিরাও এবং তাঁর অনুগামী ধোণ্ডিবা মনুষ্যসৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধোণ্ডিবা জিজ্ঞাসা করেছেন যে হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষত মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। এটা কিরূপে সম্ভব? ব্রহ্মার কি মুখে, বাহুতে, উরুতে ও পায়ে জরায়ু ছিল? সেখানে কি মাসে মাসে ঋতুস্রাব হত? ব্রহ্মা কি পুরুষ না নারী? এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাই হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি অবান্তর।

এই অধ্যায়ে জোতিরাও বলেছেন যে, প্রাচীন ইতিহাস থেকে যতটা জানা যায় তা হল ব্রাহ্মণরা ছিল ইরাণের অধিবাসী। ইরাণী-দের বলা হত আর্য। এই ইরাণীরা ছিল লুঠেরা স্বভাবসম্পন্ন। তারা দিকে দিকে লুন্ঠন করতে বেরিয়ে পড়ত। তেমনি একদল লুঠেরারা ভারতের দিকে আসে। ব্রহ্মা ছিল তাদের দলপতি। এই দলটি ভারতে প্রবেশ করে এবং শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীদের পরাভূত করে ক্রীতদাসে পরিণত করে। ব্রহ্মা ভারতবাসীদের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে বহু নিয়ম বা আইন তৈরী করে। ব্রহ্মার মৃত্যুর পর তার অনুগামীরা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। এই সময় মনু ব্রহ্মার স্থলাভিসিক্ত হয়। ব্রাহ্মণদের অধীশ্বর হয়েই মনু ব্রহ্মা প্রবর্তিত বিধি-বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ করে একখানি আইন গ্রন্থ প্রণয়ন করে। এটারই নাম হয় মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি। এরপর ব্রাহ্মণগণ ভারতীয়দের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এবং তাদের মধ্যে দাসত্বের মনোবৃত্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কল্পিত গল্প-কাহিনী তৈরী করে সেগুলিকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নামে চালাতে থাকে।

এই সব গল্প-কাহিনীর মধ্যে একটি হল ঈশ্বর সমুদ্রের মধ্যে চিৎ হয়ে অনন্তশয্যায় শুয়েছিল। সেই সময় তার নাভি থেকে একটি পদ্মফুল বেরিয়ে আসে। সেই পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট হয় চতুর্মুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা। ঈশ্বর তাকে জীবসৃষ্টির আদেশ দেয় এবং ব্রহ্মা তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম হল মৎস্য ও শঙ্খাসুর। জ্যোতিরাও বলেন যে, আর্য অর্থাৎ ইরাণীয়দের একটি মাত্র দলই ভারতে আসে নাই। তাদের একটি দল জলপথেও ভারতে এসেছিল। প্রথম যে দলটি জলপথে ভারতে এসেছিল তাদের জলযানটি ছিল লম্বাটে ধরণের, অনেকটা মাছের মত। তাই তাদের দলপতির নাম বলা হয়েছে মৎস্য। মৎস্য তার বোম্বেটে দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে এসে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করে। যে দেশে তারা অবতরণ

করে সে দেশের রাজা ছিলেন শঙ্খাসুর। মৎস্যের সঙ্গে যুদ্ধে শঙ্খাসুরের মৃত্যু হয়। তখন মৎস্য তার রাজ্য দখল করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। কিছুকাল পরে তার মৃত্যু হলে শঙ্খাসুরের অনুগামীরা সংঘবদ্ধ হয়ে মৎস্যের অনুগামীদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ সুরু করে। মৎস্যের অনুগামীরা যুদ্ধে পরাভূত হলে তারা দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে।

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম কচ্ছপ এবং সমুদ্রমন্থন। শঙ্খাসুরের অনুগামীরা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয় এবং সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। এর অল্পকাল পরেই ইরাণ থেকে আরো একটা লুণ্ঠনকারী দল জলপথে ভারতে আসে। তাদের জলযানের ছিল আরো বৃহৎ আকারের। সেগুলি দেখতে অনেকটা কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মত। সেই জলযানে অনেক বেশী লোক ধরত। এদের দলপতির নাম ছিল কচ্ছ—যাকে বাংলায় বলা হয় কচ্ছপ এবং সংস্কৃতে বলা হয় কূর্ম। কচ্ছ এসে শঙ্খাসুরের অনুগামী যারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিল তাদের রাজ্য অবতরণ করে। ক্ষত্রিয়দের দলপতির নাম ছিল কাশ্যপ। ফলে কচ্ছের সাথে কাশ্যপের যুদ্ধ বাধে। কাশ্যপ পরাজিত হলে কচ্ছ সেখানে রাজত্ব করতে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম বরাহ এবং হিরণাক্ষ্য। এই অধ্যয়ে বলা হয়েছে যে, কচেছর মৃত্যুর পর সেখানকার রাজা হল বরাহ। বরাহের মাতা পদ্মা ছিল শূকরী এবং পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কামস্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, সে যে কোন প্রাণীর সঙ্গে রতিক্রিয়া করত। শূকরীর সঙ্গে এরূপ রতিক্রিয়ার ফলে শূকরীর গর্ভে জন্ম হওয়ার জন্য ব্রহ্মার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তার নাম হয় বরাহ এবং আকৃতিও হয় অনেকটা শূকরের মত। কিন্তু ব্রহ্মার পুত্র বলে সে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিল। সে ছিল অসীম শক্তিধর। এই সময় তার পাশের রাজ্যে ক্ষত্রিয় রাজা ছিল হিরণাক্ষ্য। বরাহ

তার রাজ্য আক্রমণ করতে গেলে হিরণাক্ষ্য তাকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে হিরণাক্ষ্যের মৃত্যু হয়। হিরণাক্ষ্য নিহত হলে তার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু রাজা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম নরসিংহ এবং প্রহ্লাদ। বরাহের মৃত্যুর পর আর্য ব্রাহ্মণদের রাজা হয় নরসিংহ। নরসিংহ ছিল লোভী, নৃশংস, কাপুরুষ এবং চতুর। হিরণ্যকশিপু ছিল খুব শক্তিমান নরপতি। যুদ্ধ করে তাকে পরাভূত করার মত ক্ষমতা নরসিংহের ছিল না। তাই সে ভিন্ন পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র ছিল। তার নাম প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের গৃহশিক্ষক ছিল একজন ব্রাহ্মণ। নরসিংহ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মাধ্যমে প্রহ্লাদের মগজ ধোলাইএর ব্যবস্থা করে প্রহ্লাদকে তার পিতার বিরোধী করে তোলে। হিরণ্যকশিপু ছিল হরভক্ত অর্থাৎ শিবভক্ত। ব্রাহ্মণ শিক্ষকের শিক্ষার ফলে প্রহলাদ তাদের পারিবারিক দেবতা হরের পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের দেবতা হরির ভক্তে পরিণত হয়। নরসিংহ দূত মারফৎ প্রহলাদকে প্রলুব্ধ করতে থাকে, যাতে সে পিতাকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসে। প্রহলাদ এই প্রস্তাবে রাজী হয় না।

তখন নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে একদিন সন্ধ্যাবেলা নারীবেশে বস্ত্রের আড়ালে শিবাজীর মত বাঘনখ লুকিয়ে রেখে প্রহ্লাদের সাহায্যে হিরণ্যকশিপুর শয়নকক্ষে স্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর হিরণ্যকশিপু যখন ক্লান্তদেহে শয্যাগৃহে এসে বিশ্রামরত তখন স্তম্ভের আড়াল থেকে সিংহের মুখোশ পরে বেরিয়ে এসে নরসিংহ হিরণ্যকশিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাঘনখ দিয়ে তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বের করে হত্যা করে। তারপর দ্রুত নরসিংহ বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষমান তার অনুচরদের নিয়ে নিজ দেশে পালিয়ে যায়। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করলেও নরসিংহ কিন্তু হিরণ্যকশিপুর রাজ্য দখল করতে পারে নি। প্রহলাদ শেষ পর্যন্ত নরসিংহের কুমতলব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তার সম্পর্কে সতর্ক হয়ে

যায়। স্তম্ভের ভিতর থেকে ভগবানের অবতার নরসিংহের আবির্ভাবের কাহিনী সুচতুর ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একটি মিথ্যা প্রচার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের নাম বলিরাজা এবং বামন। প্রহলাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিরোচন রাজা হন। বিরোচনের মৃত্যুর তার পত্র বলি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলিরাজা ছিলেন একজন সুশাসক এবং ন্যায়পরায়ণ নরপতি। তার রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অরাজক অঞ্চলসমূহ যেখানে সাধারণ মানুষেরা দুর্ধর্ষ ডাকাতদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হত, সেখানে বলিরাজা ন্যায় ও সুশাসন প্রবর্তন করেন। একজন ন্যায়পরায়ণ সুশাসক হিসাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত।

বলিরাজার উপাস্য দেবতা ছিল মহাদেব। তাই তার রাজ্য সর্বদা 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে থাকত। মহাদেবের পূজার উপকরণ ছিল নারিকেল, পান ও সুপারি। তার ভক্তরা ললাটে হলুদ রঙের গুঁড়া লেপন করত।

এই সময় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিপ্রদের রাজা ছিল বামন। বামন অত্যন্ত লোভী, নৃশংস এবং একগুঁয়ে ছিল। বলিরাজার সুখ্যাতি শুনে সে মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। সে চিন্তা করতে লাগল কি করে বলিরাজার রাজ্য করায়ত্ব করা যায়। বামন তখন গোপনে বিরাট সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে আশ্বিন মাসের ১লা তারিখে বলিরাজার রাজ্য আক্রমণ করে এবং দ্রুত বেগে বলিরাজার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপ্রস্তুত বলিরাজা সংবাদ পেয়ে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বামনকে বাধা দেন। আট দিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অষ্টম দিনের শেষে বলিরাজা যুদ্ধে পরাস্ত এবং নিহত হন। বলিরাজার রাণী বিন্ধাবতী এই দুঃসংবাদ পেয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। তার পর থেকেই হিন্দু রমণীদের স্বামীর চিতায় পুড়ে মরার 'সতী প্রথা' সৃষ্টি হয়।

বলিরাজার মৃত্যুর পর তার অন্যতম সেনাপতি নবম দিনে প্রবল ভাবে বামনের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে থাকে। কিন্তু পরের দিন সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পালিয়ে যায়। ফলে দশম দিনে বামন এবং তার বিপ্রসেনা বলিরাজার রাজধানীতে প্রবেশ করে ধনসম্পদ ও সোনারুপো লুঠ করে এবং বিজয় উৎসব পালন করে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ রমণীরা এই দিনটিতে ময়দার তাল দিয়ে বলিরাজার মূর্তি তৈরী করে ঘরের প্রবেশ দ্বারে বসিয়ে রাখে এবং ব্রাহ্মণ পুরুষরা উক্ত মূর্তিটিকে মাড়িয়ে গৃহে প্রবেশ করে। এই উৎসব পালন করার পর বামন সোনা, রুপা ও অন্যান্য লুণ্ঠিত সম্পদসহ স্বদেশে ফিরে যায়।

জ্যোতিরাও-এর অনুগামী ধোণ্ডিবা জ্যোতিরাওকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বলিরাজা সম্পর্কে এটাই যদি যথার্থ ঘটনা হয়ে থাকে, তবে প্রচলিত কাহিনী যাতে বলা হয় যে, বামন একজন ক্ষুদ্রকায় ব্রাহ্মণের বেশে বলিরাজার কাছে এসে তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলিরাজা অঙ্গীকারবদ্ধ হলে বামন বিরাটাকার ধারণ করে এক পদ দ্বারা মর্ত, দ্বিতীয় পদ দ্বারা স্বর্গ এবং তৃতীয় পদ রাখার জায়গা না পেয়ে তা বলিরাজার মস্তকে রেখে তাকে পাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি তা হলে কি?

জ্যোতিরাও বলেন, এটা হল ব্রাহ্মণদের একটা গাজাখুঁরি গল্প। বামন যদি এত বৃহৎ আকৃতি ধারণ করে যে, তার প্রথম পদ মর্তকে এবং দ্বিতীয় পদ স্বর্গকে আবৃত করে ফেলে, তবে তার দেহ এবং মাথা কোথায় ছিল? তারপর সে কিভাবে বলিরাজার সঙ্গে কথোপকথন করে? যদি তার প্রথম পদ সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে থাকে, তবে পৃথিবীর জীবজন্তু কি তার পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যায় নি? সোমরস পানে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত না হলে অথবা গাঁজার দমে সম্বিতহারা না হলে কি এরূপ উদ্ভট কল্পনা কেউ করতে পারে? অতিরিক্ত গোমাংস ভক্ষণে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত এবং সোমরসের ক্রিয়ায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার ফলেই ব্রাহ্মণরা এই সব আজগুবি কাহিনী লিখে সেগুলিকে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বলে নির্বোধ ও নিরক্ষর হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায় হল ব্রহ্মার কাহিনী। বামনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মা নামে তার এক চতুর কেরানী বিপ্র বা ভাটদের নেতা হয়। ব্রহ্মা ছিল যেমন চতুর, তেমনি তার নির্দেশ ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন প্রকার। আমাদের সমাজে যেমন কেউ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কথা বললে তাকে দুমুখো ব্যক্তি বলা হয়; তেমনি ব্রহ্মা এমন ব্যাপকভাবে বিপরীত কথাবার্তা বলতো যে তাকে বলা হত চতুর্মুখো ব্যক্তি।

ব্রহ্মাই প্রথম লেখার চর্চা সুরু করে। তার আগে সব কিছু মুখে মুখে চলত। তাই পূর্বেকার যুগকে বলা হত শ্রুতির যুগ। ব্রহ্মা ইরানীদের অনুকরণে বর্ণের প্রচলন করে এবং তালপাতার উপর লোহার পেরেক দিয়া লেখার চর্চা সুরু করে। তৎকালে জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হত সর্বকৃত। পরবর্তীকালে তার থেকে সৃষ্টি হল সংস্কৃত ভাষা। ব্রহ্মা নানা প্রকার অবাস্তব ও অপ্রাকৃত গল্পকথা তৈরী করে সেগুলি তাল পাতার লিপিবদ্ধ করতে থাকে। এই সব লেখার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মা জনসাধরণকে নানা প্রকার স্থায়ী নির্দেশ দিতে থাকে।

এই সময় ব্রহ্মার অনুগামীদের মধ্যে খুব খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তারা সাধারণতঃ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে খেত এবং প্রয়োজনে ঘোড়ার মাংস আগুনে পুড়িয়ে খেত। এরূপ মাংস ভক্ষণকে যাতে কেউ নিন্দা করতে না পারে সেজন্য ব্রহ্মা পশু যজ্ঞ নাম দিয়ে ঘোড়া বা অন্য প্রাণী জবাই দিয়ে যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে খেত।

বলিরাজার পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিল বনাসুর। বনাসুরের মৃত্যুর পর তার বিস্তীর্ণ রাজ্যের আঞ্চলিক রক্ষকরা স্বাধীনভাবে চলতে থাকে। ফলে তাদের মধ্য ঝগড়াবিবাদ ও হানাহানি দেখা দেয়। এই সব রক্ষকদের ব্রহ্মা রাক্ষস নামে অভিহিত করত। সুযোগ মত ব্রহ্মা তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে একে একে এই সব রক্ষক-দের আক্রমণ করে তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি অধিকার করতে থাকে। ব্রহ্মা তার নিজের লোকদের অন্যদের থেকে চিহ্নিত করার জন্য তাদের গলায় সাদা সুতা পরার প্রথার প্রচলন করে। ব্রহ্মা

প্রচলিত এই সাদা সূতাকে বলা হয় ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মা তাদের একটা গূঢ় বীজমন্ত্র শিক্ষা দিল। এই বীজমন্ত্রকে বলা হত গায়ত্রীমন্ত্র। এই সব পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রহ্মা তার নিজস্ব লোকদের একটা সুস্পষ্ট গোষ্ঠী বা ভাটজাতিতে পরিণত করে।

বনাসুরের বিস্তীর্ণ রাজ্য দখল করার সময় যে সব ক্ষত্রিয়রা ভাটদের প্রবলভাবে বাধা দেয় তাদের তারা মহা-অরি অর্থাৎ মাহার নামে অভিহিত করে এবং অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে। (বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন এই মাহার সম্প্রদায়ের সন্তান)।

যারা ভাটদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল তাদের ধনসম্পত্তি ও জমিজমা ভাটরা দখল করে নেয় এবং তাদের তারা ক্রীতদাসে পরিণত করে। ভাটরা তাদের শূদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র নামে অভিহিত করে। ব্রহ্মা নির্দেশ দেয় যে, শূদ্ররা ভাটদের সর্বদা সেবা করবে এবং তাদের আদেশ পালন করে চলবে। যারা তা করবে না তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। প্রত্যেক গ্রাম শাসন করার জন্য এক একজন ভাটকে দায়িত্ব দেওয়া হল। তাদের উপাধি হল কুলকার্নি এবং যে সব শূদ্ররা জমিজমার চাষাবাদ করত তাদের বলা হত 'কুলওয়াদি' বা 'কুনবি'। শূদ্র মেয়েদের কৃষিকাজে সাহায্য করতে এবং ভাটদের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হল।

ভাটরা কৃষিকার্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। তারা শূদ্রদের দিয়ে যাবতীয় কাজকর্ম করিয়ে নিত এবং শূদ্রদের নিম্নমানের জীবন যাপনের জন্য যতটা জিনিসপত্র বা খাদ্যবস্তু প্রয়োজন তার বেশী দিত না। ভাটরা ব্রহ্মার তৈরী তালপাতার বই পড়াশুনা করত। ব্রহ্মার তৈরী এই সব বইকে বলা হয় শাস্ত্রগ্রন্থ। অনেক ভাট এইসব শাস্ত্রগ্রন্থের চর্চা করত এবং ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীকালে ধর্মের নামে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সুরু করা এবং এইসব অনুষ্ঠান যে সব ভাটরা পরিচালনা করত তারা দান ও দক্ষিণা নিত। এইভাবে ভাটদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হল। এই সব ভাটরাই পরবর্তীকালে মনুস্মৃতি নামে একখানি আইনগ্রন্থ তৈরী করে সমাজকে শাসন করতে থাকে। শূদ্ররা যাতে ভাটদের কলাকৌশল কোনভাবে বুঝতে না পারে সেজন্য তাদের শিক্ষালাভ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ তো

দূরের কথা, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ শ্রবণও তাদের পক্ষে চরম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

ব্রহ্মার মৃত্যুর পর ভাট সম্প্রদায় ব্রহ্মার পুত্র হিসাবে ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজরা যখন শূদ্রদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে, তখন ব্রাহ্মণগণ ইংরেজদের উপর দারুণ রুষ্ট হয়। ভারতে ইংরেজরা আইনত শাসক হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণরাই ছিল দেশের শাসক। কারণ বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক প্রশাসক প্রয়োজন তা ইংরেজদের ছিল না। ফলে তাদের ব্রাহ্মণদের সাহায্যেই প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে হত। কারণ তখন ভারতবর্ষে শিক্ষিত বলতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বোঝাত। ব্রাহ্মণরা যখন দেখল ইংরেজরা অব্রাহ্মণদের লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করছে, তখন সুচতুর ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারল যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রশাসনে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব নষ্ট হবে। তাই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করে এবং তাদের ভারত থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে ব্রাহ্মণরা দেশপ্রেম নামে অভিহিত করে।

অষ্টম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে পরশুরামের কাহিনী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরশুরাম হলো ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী। পরশুরাম ২১ বার ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিল। পরশুরাম যেমন ছিল শক্তিশালী, তেমনি নিষ্ঠুর ও একগুঁয়ে। সে এমন নিষ্ঠুর ও বর্বর ছিল যে, নিজের মাকে সে নিজের হাতে হত্যা করেছিল। ব্রহ্মার মৃত্যুর পর মহাঅরি অর্থাৎ মাহাররা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন পরশুরামের উপর দায়িত্ব পড়ল ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ মাহারদের দমন করার। পরশুরাম একবার দুবার নয়, ২১ বার মাহারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। পরশুরাম এত নিষ্ঠুর ছিল যে, যুদ্ধে মাহার-মঙসহ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের পরাভূত করার পর তাদের স্ত্রী এবং শিশুদেরও গণহত্যার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করত। মাহার মঙসহ যে সব শূদ্র প্রবলভাবে পরশুরামের বিরোধিতা করেছিল পরশুরাম তাদের

অতিশূদ্র বা অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে তাদের গলায় কালো সূতা পরিয়ে দেয়, যাতে সমাজে তাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

পরশুরাম আরো একটা নিয়ম করেছিল যে ব্রহ্মণরা যখন কোন পাকাবাড়ী তৈরী করবে তার ভিতে অতিশূদ্রদের জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত করা হবে। মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠিত পাকা বাড়ীর ভিতের তলায় অতিশূদ্র-দের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

মাহার ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে লড়াই করতে বহু ব্রাহ্মণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হওয়ায় ব্রাহ্মণ পুরুষদের সংখ্যা কমে যায় এবং ব্রাহ্মণ বিবধাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন ব্রাহ্মণ মেয়েদের বিবাহের সমস্যা দেখা দেওয়াতে পরশুরাম এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রচলন করে যে, অতঃপর বিধবাদের আর পুনর্বিবাহ হবে না। সেখান থেকেই বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে গেল।

পরশুরামের পুনঃ পুনঃ মাহারসহ ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে সারা ভারতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা হ্রাস পায়। শেষকালে উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয়কুলে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। রামচন্দ্র জনকরাজার গৃহে রক্ষিত পরশুরামের মন্ত্রপূত ধনুক ভেঙ্গে ফেলে জনকদুহিতা সীতাকে বিবাহ করে যখন অযোধ্যায় ফিরে আসে, তখন পরশুরাম তাকে পথে বাধা দেয় এবং প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরশুরাম রামের হাতে পরাস্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে যায়। সেখানে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে তার মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মণরা দাবি করে যে, পরশুরাম আদি নারায়ণের অবতার এবং সে চারযুগের অমর। জ্যোতিরাও ব্রাহ্মণদের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর পূর্বেকার প্রকাশিত ছত্রপতি শিবাজীর কাহিনী গ্রন্থে পরশুরামকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান যে, ব্রাহ্মণরা দাবি করে যে পরশুরাম আদি নারায়ণের অবতার এবং এখনো জীবিত আছেন। এই দাবিতে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি পরশুরাম জীবিত থাকে তবে সে যেন এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৬ মাসের মধ্যে সশরীরে আত্মপ্রকাশ করে। তাহলে শুধু হিন্দুরাই নয়, মুসলমান ও খৃষ্টানরাও তাকে দেখে ব্রাহ্মণদের দাবি মেনে নেবে। আর যদি

পরশুরামের দেখা পাওয়া না যায় তবে ব্রাহ্মণদের মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে এবং মাহার ও মঙরা ব্রাহ্মণদের তাদের দাসে পরিণত করবে এবং তাদের কুকুরের মাংস খাওয়াবে। জ্যোতিরাও এই ঘোষণা করেছিলেন ১৮৭২ সালের ১লা আগস্ট। কিন্তু পরশুরামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি।

নবম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে ব্রাহ্মণরা মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রদের পরাভূত করেছে এবং মন্ত্রশক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা অলৌকিক শক্তির অধিকরী হওয়াতে ক্ষত্রিয়গণ তাদের কাছে ভয়ে নতি স্বীকার করেছে। মন্ত্রপূত অস্ত্রের দ্বারা তারা ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করেছে। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিল এরূপ মন্ত্রশক্তির অধীশ্বর। তারা যে মন্ত্রশক্তির অধীশ্বর একথা বর্ণনা করে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিরা তৈরী করেছে।

ব্রাহ্মণরা যে কিরূপ শক্তির অধীশ্বর ছিল তার নমুনা স্বরূপ ভৃগু এবং নারায়ণের কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। একবার কোন কারণে ব্রাহ্মণ ভৃগু আদি নারায়ণের বুকে লাথি মারে। নারায়ণ জেগে ভৃগুকে দেখে তার পদতল মালিশ করতে থাকে, যাতে লাথি মারার ফলে তার পদতলে কোন ব্যথা লেগে না থাকে। এর দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ভগবানের চেয়েও বড়।

ব্রাহ্মণদের আর একটি কৌশল হল যাদুমন্ত্র। সাধারণ মানুষের ধারণা যাদুমন্ত্রের উৎস হল বেদ। এই সব যাদুমন্ত্রের মধ্যে অন্যতম হল 'ওঁং নমঃ', 'ওঁং রিং ক্লিং' প্রভৃতি। এই সব যাদুমন্ত্রের সঙ্গে সোমরসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্রহ্মাণরা এটা ঘোষণা করে যে, সোমরস পান করে তারা দেবতাদের সঙ্গে এমন কি স্বয়ং ভগবানের সঙ্গেও কথোপকথন করে থাকে। এই ভাবে নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে এবং নানা প্রকার ছলনার দ্বারা সাধারণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। অজ্ঞ ও সাধারণ মানুষকে তারা এভাবে বঞ্চনা করে চলছে। ভারতে আগত ইউরোপীয়

পন্ডিতগণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও চর্চা করে এরূপ মন্তব্য করেছেন।

অনেক ব্রাহ্মণ একথা প্রচার করেছে যে, ব্রহ্মা তার ৪টি মুখ থেকে ৪টি বেদ সৃষ্টি করেছে। এ কথা কতটা সত্য? জ্যোতিরাও বলেন, এগুলি নির্জলা মিথ্যা প্রচার। বেদের সঙ্গে ব্রহ্মার কোন সম্পর্ক নেই। বেদ যে সব ঋষিরা রচনা করেছেন সংশিষ্ট অংশে তাদের প্রত্যেকের নামের উল্লেখ আছে। কাজেই ব্রহ্মার চতুর্মুখের কাহিনী একেবারেই অবান্তর।

স্ত্রী চরিত্রসুলভ নারদ ছিল ব্রাহ্মণদের সার্থক চর। তার কাজ ছিল দেবতা ও ক্ষত্রিয়দের অন্তপুরে প্রবেশ করে বীণা বাজিয়ে নেচে নেচে গান শোনান এবং রাজা ও রাণীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি করা। তারপর তাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে মজা দেখা এবং অকারণে পরস্পরের শক্তি নষ্ট করা। নারদকে দেখা গেছে রাম, রাবণ, কৃষ্ণ, কংস, কৌরব, পান্ডব ও বিভিন্ন দেবদেবীদের অন্দর মহলে ঢুকে পরস্পরের নামে মিথ্যা কথা বলে তাদের মধ্য বিবাদের বীজ বপন করতে। মিথ্যা ভাষণে এবং অসত্য কাহিনী রচনার নারদ ছিল সিদ্ধহস্ত। নারদ যে কত অনর্থের সৃষ্টি করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ ছিল অব্রাহ্মণদের মগজ ধোলাই করা (যেমন বর্তমান যুগে ব্রাহ্মণ কমুনিষ্টরা করে থাকে)। তারা অব্রাহ্মণ জনগণের মধ্যে শত সহস্র কুসংস্কার, মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে অহরহ তাদের শোষণ করে চলছে এবং ক্রীতদাস বানিয়ে তাদের সেবায় লাগাচ্ছে। এই সব মিথ্যা ধ্যানধারণাকে চিরস্থায়ী করার জন্য তারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও বহু রকমের শাস্ত্র গ্রন্থ তৈরী করেছে এবং ব্রাহ্মণ পাঠকগণ কর্তৃক সেগুলি পাঠ করে ও ব্যাখ্যা করে অব্রাহ্মণদের মগজ ধোলাই করেছে। অব্রাহ্মণদের যেহেতু শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না, সেহেতু এই বিপুল সংখ্যক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে ব্রাহ্মণগণ যা শিখিয়েছে তাকেই তারা মহাসত্য ও বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করেছে।

জ্যোতিরাও আরো বলেছেন, ভাগবত গ্রন্থ অনেক পরবর্তী-কালের রচনা। মনুস্মৃতি ভাগবতেরও পরে রচিত হয়েছে। কারণ

ভগবতের অনেক কাহিনীর উল্লেখ মনুস্মৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১০৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস ভক্ষণ করেছিলেন।

দশম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও দেখিয়েছেন কিভাবে দুজন মহান ব্যক্তির দ্বারা ভারতের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও প্রবঞ্চিত শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। প্রথম জন হলেন মহামানব বুদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ ছিল ধূর্ত, নিষ্ঠুর ও ছলনাময়। পশুযজ্ঞ নামে গোহত্যা করে গোমাংস ভক্ষণ ও সোমরস নামক মাদক সেবনে তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। করুণার অবতার বুদ্ধদেব ছিলেন সাম্য ও মৈত্রীর পূজারী। ব্রাহ্মণরা বর্ণাশ্রম ও জাতিব্যবস্থার দ্বারা মানুষের মধ্যে ভেদবিদ্বেষ সৃষ্টি করে শূদ্র শ্রেণীকে পশুর স্তরে অবনমিত করে রেখেছিল। মিথ্যা কাহিনী ও ছলনাময় শাস্ত্রগ্রন্থ তৈরী করে তারা অব্রাহ্মণদের বিশেষতঃ শূদ্রদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল।

বুদ্ধদেব বললেন, সব মানুষই সমান। সকলেই ভাই ভাই। কেউ ছোটবড় হয়ে জন্মায় না। শিক্ষা ও সৎ আচরণ দ্বারা প্রতিটি মানুষই মহৎ ও সুখী হতে পারে। বুদ্ধের এই শিক্ষার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারল যে, ব্রাহ্মণরা কত স্বার্থপর এবং ভণ্ড। তারা ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগ করে বুদ্ধের শরণাপন্ন হল। বুদ্ধদেব পশুহত্যা ও মদ্যপানকে পাপ বলে ঘোষণা করলেন। ফলে ধান্দা-বাজিতে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরাজিত ও পরিত্যক্ত হল।

ব্রাহ্মণরা উত্তরভারত থেকে বিতাড়িত হল। তারা তখন প্রধানতঃ দক্ষিণভারতের কর্ণাটকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর বহু পরে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য নামে একজন সুচতুর ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটল। তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে জাগিয়ে তোলার জন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নূতন কায়দায় নাস্তিক্যবাদ প্রচার করলেন। তিনি বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব দিয়ে বেদান্ত রচনা করেন এবং বেদান্তকে বলা হল জ্ঞানমার্গ। সাধারণ মানুষের পক্ষে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ কঠিন বিধায় তিনি শিবের অবতার হিসাবে

শিবলিঙ্গের পূজার বিধান দিলেন। মূর্তিপূজক ভারতের জনসাধারণ শঙ্করাচার্যের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্মে ফিরে এল। নৃশংস ও ধূর্ত ব্রাহ্মণগণ তখন নির্মমভাবে বৌদ্ধদের উপর পাশবিক অত্যাচার সুরু করে। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ এবং তাদের বহুমূল্যবান রচনাবলী পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

এই সময় একেশ্বরবাদী মুসলমানদের ভারতে আগমন ঘটে। ফলে ব্রাহ্মণদের নির্মম অত্যাচারে বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। যে সব বৌদ্ধরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল না তাদের ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করল। কুকুরের গলায় যেমন শিকল দেওয়া হয়, তেমনি অস্পৃশ্যদের গলায় কালো সুতা পরতে বাধ্য করা হল। যাতে তাদের সহজে চিহ্নিত করা যায়। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে অনেক স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে থাকে—তাদের মধ্যে মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর, রামদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের ২য় বাজীরাও ছিলেন এদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

বলিরাজের মৃত্যুর পর ২য় বলিরাজ হিসাবে প্রায় ২ হাজার বছর পূর্বে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বমানবতা ও মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করেন। কিন্তু মানবতার শত্রু কিছু দুষ্কৃতির হাতে তিনি অকালে নিহত হন। তিনি নিহত হলেও তার ধর্ম ইউরোপ ভূখণ্ডে দারুণ প্রসার লাভ করে। তার প্রচারিত মানবপ্রেমের বাণী খৃষ্টধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মমত সারা বিশ্বে প্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে। ভারতেও তারা চলে আসে। টমাস পাইন ছিলেন একজন অসামান্য জ্ঞানী খৃষ্টধর্ম প্রচারক। তিনি ভারতে এলে অনেকেই খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খৃষ্টধর্ম ছিল সাম্য ও মানবতার ধর্ম। অজ্ঞ, দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষদের সেবা এবং যীশখৃষ্টের প্রেমের বাণী প্রচার করতে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে অনেকগুলি খৃষ্টান মিশনারী দল ভারতে চলে আসে। মানুষের অধিকার থেকে বিচ্যুত নির্যাতিত শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরা যীশুখৃষ্টের

প্রেমের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্রীতদাসত্বের কবল থেকে মিশনারীরা শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ শূদ্র এবং অস্পৃশ্য সহস্র সহস্র বছর ধরে ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষা লাভ করে সমাজে মানুষ হিসাবে মাথাউঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পেল।

ধূর্ত ব্রাহ্মণগণ বুঝতে পারল যে বৃটিশ রাজত্ব বহাল থাকলে শূদ্রও অস্পৃশ্যদের তারা আর অশিক্ষার অন্ধকারে আবদ্ধ রেখে পশুর মত ব্যবহার করতে পারবে না। তাই তারা ভারত থেকে বৃটিশ রাজত্ব খতম করতে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিশেষতঃ তাদের তৈরী ছলনাপূর্ণ মিথ্যা শাস্ত্রগ্রন্থের দোহাই পেড়ে ইংরেজদের ম্লেচ্ছ ও বিধর্মী নামে অভিহিত করে তারা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইংরেদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করতে থাকে। এছাড়া তারা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী হিসাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ব্যাপকভাবে চাকুরীতে ঢুকে প্রশাসনকে দুর্নীতির অখড়ায় পরিণত করে এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব গড়ে তুলতে থাকে।

একাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও ফুলে বলেছেন কিভাবে বহিরাগত হানাদার আর্য নামক ভাটরা ভারতের ভূমিপুত্রদের পরাভূত করে ভারতে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তারা যেমন ছিল দুর্ধর্ষ, তেমনি ছিল সুকৌশলী। তারা পশুশক্তি প্রয়োগ করে যেমন দেশ দখল করেছে, তেমনি জোর করে সুকৌশলে তাদের ধর্মমতকে ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যার পর সাধারণ মানুষদের জড় করে তাদের তৈরী করা ধর্মের কথা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা শোনায়। বিশেষ করে তাদের মনগড়া নানা ধর্মীয় কাহিনী শুনিয়ে সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করতে থাকে এবং অজ্ঞ মানুষদের মানসিক দিক দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করে। এই কাজে ভাগবত গ্রন্থটি ছিল তাদের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। ভাগবতের মধ্যে যে সব অলৌকিক ও অনৈতিক ইন্দ্রিয়-

পরতন্ত্র কাহিনী তারা তৈরী করেছিল তা সহজেই সাধারণ মানুষের মনকে আকর্ষিত ও কলুষিত করে।

এই সুযোগে তারা খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মনকে বিষাক্ত করতে থাকে এবং বিদেশী সাগরপারের ইউরোপীয়দের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে বলে। সুচতুর ভাটদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ধীরে ধীরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। এই ব্যাপারে উত্তর ভারতের ভাট নেতা মঙ্গল পাণ্ডে, কঙ্কনের নানাসাহেব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তাতিয়া টোপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ নেতাদের ষড়যন্ত্রে ঐতিহাসিক সিপাহী (চাপাটি) বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকার ইংরেজদের পক্ষে থাকার ফলে ইংরেজদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ভাটদের এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সেজন্য তারা ভারতবাসীদের উপর বেশী করে ট্যাক্স ধার্য করে। এই ট্যাক্স ধার্য করার দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্রামের কুলকার্নিদের উপর। এই কুলকার্নিরা ছিল ব্রাহ্মণ। তারা শূদ্র কৃষকদের উপর বেশী বেশী করে এবং স্বজাতি ভাটদের উপর কম ট্যাক্স ধার্য করে। মুসলমানরা ছুরি দিয়ে গলা কেটে জবাই করত গরু ও মুরগীকে; আর আর্য ভাটরা শূদ্রদের জবাই করত কলম দিয়ে। জ্যোতিরাও ট্যাক্সধার্য ও আদায়কারী গ্রাম্য কুলকার্নিদের 'গ্রাম্য দানব' নামে অভিহিত করতেন। তারা যে কেবলমাত্র কৃষকদের উপর বেশী ট্যাক্স ধার্য করত তাই নয়, তারা গ্রামের কৃষকদের নোটিশ দিয়ে দিনের পর দিন তাদের অফিসে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে নিপীড়ন করত।

শূদ্র কৃষকদের অর্থ অপহরণের জন্য আর্য ভাটেরা ধনের দেবী লক্ষ্মীর নামে নানা মন্ত্রতন্ত্র তৈরী করে তাকে তুষ্ট করে ধনসম্পদ লাভের বাহানা করে শূদ্রদের কষ্টার্জিত অর্থ ও খাদ্যসম্ভার অপহরণ করত। শূদ্রদের আরো ব্যাপকভাবে ও স্থায়ীভাবে শোষণ করার জন্য তারা পাথর দিয়ে শিবের লিঙ্গ বানিয়ে বড় বড় মন্দির করে তার মধ্যে শিবের মূর্তি বা তার লিঙ্গ স্থাপন করল এবং তার দৈনিক পূজা ও নানা অনুষ্ঠানের নামে শূদ্রদের মগজ ধোলাই করল। ফলে অজ্ঞ শূদ্রা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ঐসব মন্দিরে

অকাতরে দান করতে থাকে এবং অলস, প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ ও ভাটদের পুষ্টি ও বিলাসের সামগ্রী যোগাতে থাকে। অনবরত ঘেউ ঘেউ-কারী কুকুরের মত সকালে বিকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিরর্থক বেদের মন্ত্রসমূহ সোচ্চার পাঠ করা ছিল ভাটদের প্রধান কাজ।

আধুনিক যুগে এই সব প্রবঞ্চক ও বিলাসী ভাটদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ২য় বাজীরাও। তিনি এই সব ভাটদের জন্য রাজকোষ হতে নিয়মিত মোটা ভাতা দিতেন, যে রাজকোষের যোগান দিত রাজ্যের শূদ্র চাষীরা। দুঃখের বিষয় বৃটিশ সরকারও ভাটদের নিরর্থক সংস্কৃত চর্চার জন্য বৃত্তি দান করে যাচ্ছে এবং সরকারী সাহায্য পুষ্ট হয়ে ধর্মের ষাড়ের ন্যায় ভুঁড়ি মোটা করে ও তিলক মেখে তারা সমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সব ভণ্ডের দল তাদের পাদোদক সেবন করিয়ে শূদ্রদের কৃতার্থ করছে।

আজ ইংরেজ, স্কটিশ ও আমেরিকান মিশনারীরা ভাটদের যুগ যুগান্তের শিকার শূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের মনে যুক্তিমূলক চিন্তাধারার সঞ্চার করে ভাটদের ক্রীতদাসত্বের কবল থেকে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে। তার ফলে বিভিন্ন জাতের হাজার হাজার শূদ্র আজ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে পারছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও গ্রামের ভাট কুলকার্নি, পাতিল ও শিক্ষকদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। কুলকার্নিরা ছিল গ্রামের জমিজমা ও তাতে উৎপন্ন ফসলাদির সরকারি হিসাব রক্ষক। কুলকার্নিরা প্রায় সকলেই ছিল ভাট। কৃষকরা প্রায় সবাই ছিল শূদ্র। ভাট কুলকার্নিদের প্রধান কাজ ছিল শূদ্র কৃষকদের নানা পদ্ধতিতে শোষণ করা এবং নির্যাতন করা। উচ্চস্তরের ইংরেজ অফিসাররা মোটামুটিভাবে উৎপাদক কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন। তারা কুলকার্নিদের ভূমিকা কিছুটা অবগত ছিলেন। ফলে কুলকার্নিরা যাতে কৃষকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার না করতে পারে তজ্জন্য তারা কিছু নিয়মকানুন তৈরী করে দিয়েছিলেন। শূদ্র কৃষকরা ছিল নিরক্ষর। তারা এই সব নিয়মকানুন সম্পর্কে কিছুই

জানত না। ফলে কুলকার্নি'রা তাদের যেমন বুঝাতো কৃষকরা সেটাই বিশ্বাস করত।

জ্যোতিরাও এই কুলকার্নিদের বলতেন 'মসীধারী কশাই'। তারা একদিকে শূদ্র কৃষকদের নানাভাবে শোষণ করত; আবার ইংরেজদের সম্পর্কে নানা প্রকার মিথ্যা গল্প তৈরী করে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ করে তুলত। ইংরেজরা চাইত শূদ্ররাও শিক্ষালাভ করুক এবং তারা উন্নতি লাভ করুক। ভাট কুলকার্নিদের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করে বহু শূদ্র কৃষকের ইংরেজদের প্রতি খুব খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে কুলকার্নি'রা যতই নির্যাতন করুক না কেন, শূদ্র কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে কোন অভিযোগ জানাত না। তা ছাড়া বৃটিশ সরকারের নীচু থেকে উচু পর্যন্ত বেশীর ভাগ সরকারী কর্মচারী ছিল ব্রাহ্মণ এবং তারা তাদের জাতভাই কুলকার্নিদের কথাই বিশ্বাস করত। তাই জ্যোতিরাও প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রত্যেক গ্রামে একজন করে ইংরেজ অথবা স্কটিশ মিশনারী রাখা হোক—যাতে সে গ্রামের কৃষকদের অবস্থা এবং কুলকার্নিদের কুকীর্তির রিপোর্ট মাঝে মাঝে সরকারের কাছে পাঠিয়ে গ্রামের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে পারে। এটা না করা হলে নিরক্ষর ও দরিদ্র শূদ্র কৃষকরা প্রবঞ্চক ভাট কুলকার্নিদের দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্যাতিত ও শোষিত হতে থাকবে।

জ্যোতিরাও আরো প্রস্তাব দেন যে, শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে কুলকার্নি নিয়োগ না করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের মধ্য থেকে কুলকার্নি নিয়োগ করা হোক। তিনি বলেন এজন্য সরকারের উচিত হবে জিলা কলেকটরের অফিস সংলগ্ন কোন বাড়ীতে ট্রেনিং স্কুল তৈরী করে জিলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এবং উপযুক্ত যুবকদের কুলকার্নি, পাতিল, গ্রাম্য শিক্ষকের কাজ ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষাদান করা এবং তাদের মধ্য থেকে উক্ত পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করা।

তিনি বলেন গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। তারা তাদের জাতভাই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। তারা

অন্য শ্রেণীর ছাত্রদের উপর নানাভাবে নির্যাতন ও বিদ্রূপ করত, যাতে তারা পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং স্কুলে না আসে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, আজ পর্যন্ত মাহার, মঙ এবং অন্যান্য নীচুবর্ণের একজনও শিক্ষিত হয়ে কেন কর্মচারী বা অফিসার হতে পারল না?

কুলকার্নিদের অনেকে দরিদ্র ও নিরক্ষর শূদ্র কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের টাকা ঋণ দিত এবং টীপসহি নিয়ে খত তৈরী করে রাখত। তারা সেই সব খতে এমন সব শর্ত দিয়ে রাখত যে, নিয়মিত কিস্তী দিলেও ঋণ শেষ হত না এবং শেষকালে মামলা দায়ের করে তাদের জমিজমা ও সম্পত্তি কব্জা করা হত।

কুলকার্নিদের আরো একটি কীর্তি ছিল। তারা শূদ্র কৃষকদের পরস্পরের মধ্যে সর্বদা ঝগড়াবিবাদ বাধিয়ে রাখত। কৃষকদের মধ্যে যে সব খুঁটিনাটি বিবাদ দেখা যায়, অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, তার মধ্যে কুলকার্নিদের কোন না কোন কারসাজি রয়েছে। এই সব কুলকার্নিদের জ্যোতিরাও 'নারদের উত্তরপুরুষ' নামে অভিহিত করেছেন।

এই অধ্যায়ে তিনি কুলকার্নিদের চরিত্রের আরো একটি অনবদ্য দিক উদ্ঘাটন করেছেন। যে কোন সরকারী কাজের জন্য উৎকোচ গ্রহণ ছাড়া তারা কোন কাজ করত না। বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জন করা ছিল তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যদি কোন কৃষক তার ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে উচ্চতর কর্তৃ-পক্ষের কাছে অভিযোগ জানাত বা বিচার প্রার্থনা করত তাহলে কুলকার্নিরা এমনভাবে জাল রেকর্ড-পত্র করত এবং উচ্চতর ক্ষেত্রে তাদের জাতভাই অফিসারদের এমনভাবে প্রভাবিত করত যে, বুদ্ধিমান উচ্চতর ইংরেজ কর্তৃপক্ষও আসল তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হতেন না এবং উল্টে অভিযোগকারী নিরক্ষর কৃষক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ভোগ করত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিচার চাইতে গিয়ে দরিদ্র কৃষকগণ এমনভাবে হেনস্থা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে কিংবা পাগলে পরিণত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও দুষ্ট প্রকৃতির ভাট মামলাতদারদের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন। মামলাতদাররা হল কলেকটরের অফিসের তহশীলদার। এই মামলাতদারদের অনেকের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুষ্কর্মের অভিযোগ শোনা যায় এবং অনেকের শাস্তিও হয়েছে। তারা এত অসৎ প্রকৃতির এবং দরিদ্র কৃষকদের নির্যাতনকারী ছিল যে, তাদের দুষ্কর্মের সব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করলে মহাভারত রচিত হয়ে যাবে। এরা শুধু কুলকার্নিদের জাতভাই ছিল তাই নয়; এরা সর্বদা কুলকার্নিদের সঙ্গে যোগসাজসেই কাজকর্ম করত। সরকারের নিকট থেকে সাহায্যপ্রার্থী কোন গরীব কৃষকের আবেদনের সঙ্গে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির জামিনপত্র থাকলেও মামলাতদাররা দাবি করত কুলকার্নিদের সুপারিশ পত্র। কুলকার্নিদের নিকট থেকে সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করতে কৃষকদের যে কি পরিমান ঘুস দিতে হত এবং কি পরিমাণ হয়রানি ভোগ করতে হত তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই অবগত। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের জাতভাই 'মসীকশাই' কুলকার্নিদের অশিক্ষিত কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দেওয়া।

মামলাতদারদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ অশিক্ষিত শূদ্র কৃষকরা প্রায়ই করত সেগুলি ছিল—(১) কুলকার্নিদের প্ররোচনায় মামলাতদররা কৃষকদের দরখাস্ত গ্রহণ করতে নানাপ্রকার টালবাহানা করত, যাতে বিবাদীপক্ষ অবৈধ সুযোগ লাভ করত। (২) সময় মত দরখাস্ত পেলেও মামলাতদাররা কৃষকদের অভিযোগপত্র চেপে রাখত এবং বিবাদীদের দরখাস্ত গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কৃষকদের আরো দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিত। (৩) মামলাতদাররা কৃষকদের বিবৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাল রেকর্ড করত, যাতে পরবর্তীকালে তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৪) কেউ হয়ত মামলাতদারদের যোগসাজসে কোন কৃষকের চাষ করা জমিতে জোর করে বীজ বপন করল এবং কৃষক যখন মামলাতদারদের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাল, তখন সেই মামলাতদার ক্রুদ্ধ হয়ে কোর্ট অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে কৃষককে জরিমানা করে তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করত, অথবা তাকে কিছু দিনের জন্য জেল খাটিয়ে ছাড়ত।

(৫) কোন কৃষক হয়ত তার জমি অন্যায়ভাবে দখলের বিরুদ্ধে ইংরেজ কালেকটরের কাছে অভিযোগ পেশ করল ; কিন্তু কালেক-টরের ভাট সেক্রেটারী মামলাতদারদের প্ররোচনায় কৃষকের দরখাস্তই লোপাট করে দিত। (৬) অনেক সময় ভাট সেক্রেটারী ইংরেজ কালেকটরের কাছে কৃষকের দরখাস্ত বিকৃত করে পাঠ করে শোনাত ; যার ফলে কালেকটর মামলাতদারের রায়কে সমর্থন করে কৃষকের প্রতিকারের চেষ্টা ভণ্ডুল করে দিত। (৭) এরূপ অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, কালেকটরের কাছে সুবিচার না পেয়ে অনেকে কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কমিশনারের অফিসে যে সব ভাট অফিসাররা কাজ করে, তারা কৃষকদের কাগজ-পত্র এমন এলোমেলো ও বিকৃত করে কমিশনারের কাছে পেশ করে যে, কমিশনার বিরক্ত হয়ে কালেকটরের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান এবং কালেকটরের অফিসের ভাট কর্মচারীরা মূল দরখাস্তটা পাল্টে দিয়ে এমন রিপোর্ট তৈরী করে পাঠায় যে, তা শেষ পর্যন্ত অভিযোগকারীর বিপক্ষে যায়। (৮) কমিশনার বা বিচারকরা তো কাগজপত্র দেখে তাদের রায় দেবেন ; কিন্তু যেখানে কাগজ-পত্রই জাল বা বিকৃত করে তৈরী করা হয় সেখানে রায় সঠিক হবে কি করে? (৯) শূদ্র কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে ভাট অফিসারদের ঘুষ দিতে দিতে তাদের অনেকে-রই জমিজমা, ঘরবাড়ী, টাকা-পয়সা, এমন কি বাড়ীর মেয়েদের গহনাপত্র পর্যন্ত হারাতে হয়।

যে সব শূদ্র মজুররা রাস্তা নির্মাণের কাজে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে তাদের বঞ্চনা আরো বেদনাদায়ক। (১) ভাট সুপার-ভাইজাররা ডবল বেতন পেয়ে থাকে। প্রথমতঃ তারা সরকার থেকে তো ভাল বেতন পায়। দ্বিতীয়তঃ তারা দিনমজুরদের সামান্য বেতন থেকেও একটা অংশ পকেটস্থ করে। যদি কোন দিনমজুর অংশ দিতে রাজী না হয়, তবে কাজ করা সত্ত্বেও তাকে অনুপস্থিত দেখান হয়। (২) এখানেই শেষ নয়, এই সব দিন-মজুরদের তাদের সুপারভাইজারদের বাড়ীতে কাজ করে দিতে হয়। এরূপ ঘটনার উল্লেখে পাওয়া গেছে যে, কোন কোন সুপার-ভাইজার অর্থলিপ্সু বিধবাদের বাড়ীতে সারারাত্রি স্ফূর্তি করে

কাটাচ্ছে ; আর কোন দিনমজুরকে সুপারভাইজারের বাড়ীতে সারা রাত্রি পাহারা দিতে হচ্ছে।

কৃষক ও দিনমজুরদের উপর এরূপ শত শত অত্যাচারের কাহিনী রয়েছে। মহারাষ্ট্রের ভাটরা দেশটাকে তাদের ঘাস তালুকে পরিণত করেছে। গ্রামের শূদ্র কৃষকদের এবং সরকারী কাজে নিযুক্ত মজুরদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও শোষণ চলছে। বৃটিশ সরকারের কর্তব্য হল ভাট কর্মচারী ও অফিসারদের এবং মামলাতদারদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের উপর নজর দেওয়া এবং এ সবের প্রতিকারে মনোনিবেশ করা।

চতুর্দশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের দুর্নীতি ও শূদ্র শোষণের বিরুদ্ধে ইংরেজ অফিসারদের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। দেবোত্তর ও ইলামভোগী ব্রাহ্মণ খোটদের শোষণ এবং কৌশল সম্পর্কে ইংরেজ অফিসার ও কালেকটররা ওয়াকিবহাল থাকলেও তার প্রতিকার করতে সক্ষম হয় নি। প্রথমতঃ ভাট কর্মচারীদের লাল ফিতার কারসাজি। তারা এমনভাবে হিজিবিজি করে গাদা গাদা ফাইল ইংরেজ কালেকটরদের টেবিলে ঢিবি করে রাখত যে, তারা জরুরী ফাইল নিয়েই ডুবে থাকত। ভাট কর্মচারীদের দুর্নীতি ও কৌশল ধরতে পারলেও সে বিষয়ে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট করার সময় তারা পেত না। দ্বিতীয়তঃ ভাট খোটরা আমেরিকার ক্রীতদাস মালিকদের গৃহীত কৌশলগুলি অবলম্বন করে শূদ্রদের উপর ধর্মীয় প্রভাব খাটিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করত যে, তারা ইংরেজদের প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণ করত যে, শূদ্রদের প্রতি সহৃদয় ইংরেজ কালেকটরদেরও তারা সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখত এবং তাদের সপক্ষের প্রস্তাবসমূহেরও তারা প্রবল বিরোধিতা করত। অর্থাৎ সুকৌশলী ভাটদের প্ররোচনায় তারা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারত। ধর্মীয় কলাকৌশলে শূদ্রদের বোকা বানিয়ে রাখা ছিল ধূর্ত ভাটদের নীতি।

এই সব বিভ্রান্ত ও নির্বোধ শূদ্রদের বোঝাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম

ছাড়া কিছু নয়। তাই জ্যোতিরাও বলেছেন তাদের পিছনে সময় নষ্ট না করে সদাশয় ইংরেজ সরকারকে দেশের শ্রমজীবী অশিক্ষিত শূদ্র কৃষক সমাজের প্রকৃত অবস্থাটি জ্ঞাত করান হবে কার্যকরী পথ। জ্যোতিরাওই প্রথম বৃটিশ সরকারের কাছে জনসংখ্যার হারে অব্রাহ্মণদের সরকারী কাজে নিযুক্ত করতে প্রস্তাব রাখেন। এদিক থেকে জ্যোতিরাওই ছিলেন ভারতে আধুনিক সংরক্ষণ নীতির প্রথম প্রবক্তা। যদি অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ইংরেজদের নিয়োগ করতে বলেন।

তিনি আরো প্রস্তাব দেন, যে সব ইংরেজরা ভালভাবে মারাঠী বলতে ও বুঝতে পারেন তাদের গ্রামেগঞ্জে স্থায়ীভাবে পোস্টিং করতে—যাতে তারা সরাসরি জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। তাহলেই তারা বুঝতে পারবেন, ধূর্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা কিভাবে সাধারণ মানুষদের ঠকাচ্ছে এবং শোষণ করছে। তাদের নিকট থেকে যথার্থ রিপোর্ট পেয়ে ইংরেজ সরকার দেশের প্রকৃত অবস্থা সর্বদা অবহিত হতে পারবেন। বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগে মারাঠী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করা হলে তারা সহজেই ধরতে পারবেন যে, শিক্ষাবিভাগে ব্রাহ্মণগণ কি ধরণের ঘুঘুর বাসা তৈরী করে রেখেছে। যদি শূদ্রদের সঠিক-ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে তারা বৃটিশ শাসনের সুফল বুঝতে এবং একথা জানতে পারবে যে, বৃটিশ সরকারই তাদের ব্রাহ্মণদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের অধিকার দান করতে সচেষ্ট হয়েছে। এর ফলে ব্রাহ্মণদের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা বৃটিশ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকবে।

ব্রাহ্মণরা দেশপ্রেমের নামে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। অথচ এই ব্রাহ্মণরাই ধর্মের নাম করে ভারতবাসীদের হাজার হাজার জাতে বিভক্ত করে হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের প্রাধান্য সৃষ্টি করে অন্যদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে। তাদের মধ্যে যদি দেশপ্রেম বলে কিছু থাকত, তবে দেশের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করে তাদের ক্রীতদাস করে রাখত না। তারা শিক্ষার

অধিকার থেকে অব্রাহ্মণদের বঞ্চিত করে রেখেছিল। যদি কেউ শিক্ষালাভের কোন প্রকার চেষ্টা করেছে তার প্রতি তারা কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছে; এমন কি তাকে হত্যাও করেছে। রামায়ণের রাম কর্তৃক স্বহস্তে শম্বুক হত্যা তার অন্যতম নিদর্শন।

যে ইংরেজরা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাদিগকে পশুর পর্যায় থেকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ব্রাহ্মণরা আমাদের প্ররোচিত করছে। আমরা কি এমনই মূর্খ যে আমরা আমাদের মুক্তিদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব? জ্যোতিরাও একথা বলেছেন যে, ইংরেজরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে চিরকাল থাকবেন না। কিন্তু যতদিন তারা আছেন ততদিন তাদের সাহায্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষালাভ করে যুগযুগান্তর ধরে ব্রাহ্মণদের দাসত্ব ও শোষণ থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করি। দেশপ্রেমের নাম করে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য ভণ্ড ব্রাহ্মণদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, যাতে তারা রাজক্ষমতা লাভ করে পুনরায় শূদ্র ও অস্পৃশ্য সমাজকে চিরস্থায়ীভাবে ক্রীতদাস করে রাখতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও দেখিয়েছেন কিভাবে ব্রাহ্মণ সাংবাদিকরা ব্রাহ্মণদের দুষ্কর্মের সাফাই গেয়েছে এবং সরকার ও জনসাধারণকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে বিভ্রান্ত করেছে। 'দক্ষিণা প্রাইজ কমিটির' ভূমিকাও ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের স্বার্থরক্ষা করা। ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রধান কাজ ছিল শূদ্র এবং অতিশূদ্র সমাজের ছাত্রদের যাতে শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত করে রাখা যায় প্রাণপণে তার চেষ্টা করা। এক সময় স্কুলপাঠ্য হিসাবে একখানি বই ছিল যাতে হিন্দুশাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্মণদের স্বার্থে যে কৌশল ও মিথ্যাকাহিনী রয়েছে তার মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছিল। ধূর্ত ব্রাহ্মণরা নানা কৌশলে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সাংবাদিকরা তাদের পত্র-পত্রিকায় সেই বইটি সম্পর্কে নানা প্রকার কাল্পনিক অভিযোগ প্রচার করে এবং বইটি শিক্ষা বিভাগ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। শিক্ষা বিভাগের ধূর্ত ভাটদের পরামর্শে

সরকার এমন সব বই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত করে, যাতে ভাটদের পূর্বপুরুষদের গৌরবান্বিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সববই লেখার জন্য ভাট রচয়িতাদেরও মোটা অঙ্কের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সরকারের উচিত এই সব বই নিষিদ্ধ করা এবং এই সব বইএর লেখকদের শিক্ষা বিভাগ থেকে দূরে রাখা।

কৃষক সমাজের উপর ট্যাক্স ধার্য করে এই সব ধূর্ত ভাটদের পোষণ করা সরকারের পক্ষে খুবই অনুচিত হচ্ছে। শূদ্র শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে দৈনিক উপার্জন করছে ৪ আনা পয়সা। আর একজন ভাট অফিসার মাসে বেতন পাচ্ছে ৬০০.০০ টাকা। জ্যোতিরাওএর অভিমত অনুসারে দৈনিক ২০.০০ টাকা বেতনে ভাট অফিসারের পরিবর্তে মাসে ১০.০০ বেতনের একজন মিশনারী প্রচারক অনেক বেশী কার্যকরী শিক্ষা দেশের কৃষক শ্রেণীকে দিতে পারে। আশ্চর্যের কথা শিক্ষা বিভাগের এই সব ভাট অফিসাররা বছর বছর সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন ধবংস করে শূদ্র সমাজের একজন শিক্ষকও তৈরী করতে সক্ষম হয় নি।

এবার পুনা শহরের পুরসভার জল সরবরাহের কথা উল্লেখ করা যাক। এই বিভাগের শতকরা ৯৫ ভাগ কর্মচারী ছিল ব্রাহ্মণ। তারা ব্রাহ্মণ এলাকার জলধারে প্রচুর জল সরবরাহ করত, যাতে তাদের বাসন মাজা থেকে কাপড়-চোপড় ধোয়ার জলের অভাব ছিল না। কিন্তু শূদ্র এলাকাতে পানীয় জলও পর্যাপ্ত পরিমানে পেত না। নূতন নূতন যে সব জলাধার তৈরী হত, তা প্রায় সবই তাদের জাতভাই ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকাতে করা হত।

এই সব ব্যাপারে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে জ্যোতিরাও বলেন যে, ব্রাহ্মণ সাংবাদিকরা তাদের জাতভাইদের দুষ্কর্ম বা দুর্নীতির কখনো নিন্দা করতো না; বরং তাদের সমর্থনে অনেক অসত্য সংবাদ পরিবেশন করত। প্রথম দিকে পুনা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন একজন ইংরেজ। তিনি সকল নাগরিদের সমান চোখে দেখতেন। এতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা দারুণ ক্ষুব্ধ হয় এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সাংবাদিকরা এত চতুর যে, তারা সর্বদা দেশের কৃষকদের

স্বার্থবিরোধী ও নানা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত।

জ্যোতিরাও-এর এক অনুগামী তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন—তাঁর স্কুলে এক সময়ে ২।৩ জন ব্রাহ্মণ বন্ধু শিক্ষক হিসাবে কাজ করতেন এবং জনৈক ইংরেজ রেভিনিউ কমিশনার মিঃ রিভাস তাঁর খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি জ্যোতিরাওকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিতেন। তাঁরা কেন জ্যোতিরাওকে সাহায্য করা বন্ধ করলেন ?

উত্তরে জ্যোতিরাও বলেন যে, তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধুরা চেয়েছিলেন যে শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হোক। হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। জ্যোতিরাও চেয়েছিলেন শূদ্র ছাত্রদের হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে এরূপ শিক্ষাদান করা হোক, যাতে তারা শাস্ত্রের ভালমন্দ নিজেরাই বুঝতে পারে। প্রধানতঃ এই কারণেই ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ জ্যোতিরাওএর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতিরাওএর গুণগ্রাহী উচ্চ-পদস্থ ইংরেজগণ তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা দান করতেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা ভারতবাসীদের সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করে এবং ভারতবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা নিরাপদ মনে করে না। ফলে ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর পূর্বেকার সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সাহায্যের দ্বারও বন্ধ হতে থাকে। তজন্য জ্যোতিরাও প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিও একে একে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ এই ধারণা পোষণ করত যে, শূদ্র ও অস্পৃশ্যগণ যদি শিক্ষালাভ করে তবে হিন্দুসমাজে প্রলয় দেখা দেবে। বৃটিশ সরকার ব্রাহ্মণ সমাজের এই মনোভাবে যথেষ্ট পরিমানে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলে শূদ্র ও অতিশূদ্র প্রার্থী নিবাচনের ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার অনেকটা উদাসীন ছিল। ফলে শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলগুলি ব্রাহ্মণদের এক-চেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। ফলে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শূদ্র বা অতিশূদ্রদের প্রবেশের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

জ্যোতিরাও বলেন এই ব্যবস্থার প্রতিকারের একমাত্র পথ হল,

যদি প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব ইংরেজ কালেকটরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ অফিসারদের উপর নির্ভর না করে গ্রামের কুলকার্নি-দের সুপারিশ ছাড়াই যদি কালেকটররা নিজেদের দায়িত্বে সরাসরি সকল শ্রেণীর মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করেন, তবেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করতে পারে। শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিযুক্ত না হলে নিম্নবর্ণের মানুষ-দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কোন সম্ভাবনা নেই।

জ্যোতিরাও আরো বলেন যে, ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের চেয়ে অনেক কম বেতনে অব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ নিষ্ঠা সহকারে কাজ করবেন। তাতে শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয়বরাদ্দও অনেক কম হবে। ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ কর্তব্যে ফাঁকি দিতে দারুণ ওস্তাদ; কিন্তু অব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ কখনো কর্তব্যে অবহেলা করেন না। তারা নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী এবং অল্পে সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ যেমন ফাঁকি-বাজ, তেমনি স্বার্থপর ও ধূর্ত। এই ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণই সদাশয় ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতিকে বানচাল করে দিচ্ছে।

ষোড়শ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে জ্যোতিরাও ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মরাক্ষস নামে অভিহিত করেছেন। ব্রাহ্মণগণ কিভাবে দেশের শূদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ এবং তাদের অর্থ, শস্য ও শ্রমকে লুণ্ঠন করে তার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের শোষণ ও লুণ্ঠনের প্রধান অস্ত্র ছিল ধর্ম এবং তাদের মনগড়া কৃত্রিম শাস্ত্রগ্রন্হসমূহ। এই সব শাস্ত্র-গ্রন্হে তারা ব্রাহ্মণদের ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং মানুষের মুক্তিদাতা হিসাবে বর্ণনা করেছে। ব্রাহ্মণরাই ছিল দেশের একমাত্র শিক্ষিত সমাজ। ফলে বৃটিশ সরকারের সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট তারাই ছিল সরকারী কর্মচারী। তাদের হাতেই ছিল সরকারী ক্ষমতা। এই সরকারী ক্ষমতা দেশের শ্রমজীবী মানুষদের নানাভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করতে ব্রাহ্মণদের সাহায্য করেছে। বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণরা ছিল শ্রমবিমুখ, অলস, বিলাসী এবং স্বার্থপর। এই সব অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী ব্রাহ্মণদের কেবলমাত্র আমেরিকার নিষ্ঠুর দাস ব্যবসায়ী নিগ্রো প্রভুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অবশ্য ব্রাহ্মণ

সমাজে যে দু'চারজন সদাশয় ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন না তা নয় ; তবে তারা ছিলেন ব্যতিক্রম।

জ্যোতিরাও ১৮৭২ সালের ৫ই ডিসেম্বর একখানি পত্র লিখে তা প্রকাশের জন্য একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন খ্রীষ্টান সম্পাদকের কাছে পাঠান। বিষয়বস্তুর বিচার করে চিঠিটির শিরোনাম দেওয়া হয় "কিভাবে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে ?" চিঠির বয়ানটি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা ইরাণ থেকে ভারতে আসে এবং ভারতবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। পরবর্তীকালে ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে বহু মনগড়া মিথ্যা ও কৃত্রিম শাস্ত্রগ্রন্থ লিখে জাতব্যবস্থার চিরস্থায়ী নিগড় তৈরী করে ভারতবাসী দাসদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে এবং তাদের শ্রমে অর্জিত সম্পদ নানা কৌশলে উপভোগ করতে থাকে। শেষকালে ইংরেজরা ভারতে আসে। তারা এসে ভারতের শ্রমজীবী শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের দুর্দশা দেখে বিশেষতঃ ইংরেজ ও আমেরিকান পাদ্রীরা গভীর দুঃখ বোধ করে এবং ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করার কথা চিন্তা করে। তারা দেখল বুদ্ধিজীবী অত্যাচারী ব্রাহ্মণরা সারাভারতকে এক বিশাল কারাগারে পরিণত করে রেখেছে। ভারতের আপামর জনগণের কাছে তারা ঘোষণা করল —'বন্ধুগণ আমরা সমস্ত মানুষেরা সমান। একই ঈশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। যখন আমরা সকলে সমান তখন কেন তোমরা ব্রাহ্মণদের মিথ্যা শাস্ত্রগ্রন্থের বিধান মেনে তাদের দাসত্ব করছ ? তারা আমাদের কাছে সত্যের আলো জ্বালিয়ে দিল। সেই সত্যের আলোতে আমি মানুষ হিসাবে আমার যথার্থ অধিকার বুঝতে পারলাম। আমি ব্রাহ্মণদের মিথ্যা শাস্ত্রের তৈরী দাসত্বের কারাগারের দ্বার লাথি মেরে খুলে মানবতার মুক্ত আলোকে বেরিয়ে এলাম। ইংরেজ মিশনারীদের বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি নিম্নলিখিত সংকল্প গ্রহণ করেছি—

"ধর্মের নামে ব্রাহ্মণদের তৈরী করা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী ঘৃণ্য শাস্ত্রসমূহ—যাতে শূদ্র ও অতিশূদ্রদের মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত

করেছে, তাকে আমি কঠোর ভাষায় নিন্দা করছি। আমি সেইসব গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করি—যাতে বলা হয়েছে সকল মানুষ সমান এবং সকলের বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ভোগ করার সমান অধিকার রয়েছে। সেই সব গ্রন্থ যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের মানুষ রচনা করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মনে করি, সেই সব মহান গ্রন্থের রচয়িতাদের আমি ছোট ভাই এবং আমরা সকলেই একই সৃষ্টিকর্তার সন্তান।"

"দ্বিতীয়তঃ ভারতে ব্রাহ্মণ নামধারী একটা শ্রেণী আছে—যারা তাদের স্বদেশবাসী বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে ঘৃণ্য এবং হীন পশুতুল্য অমানুষ বলে মনে করে এবং কৃত্রিম শাস্ত্রগ্রন্থ তৈরী করে নিজেদের-কে সকলের প্রভু বলে ঘোষণা করে অন্য সকলকে ধর্মের নামে শোষণ ও অত্যাচার করে চলছে। আমি তাদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার মেনে নেব না। আমি যদি তাদের প্রভুত্ব মেনে নেই, তা হবে আমাদের সকলকে যিনি সমান করে সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টি-কর্তার মহান আদর্শকে অবমাননা করা। তাই যে সব শূদ্র এবং অতিশূদ্ররা কঠোর পরিশ্রম করে সদ্‌ভাবে জীবিকা অর্জন করছে এবং যারা সৃষ্টিকর্তাকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাচ্ছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার মহান আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করছে। যারা সৃষ্টি কর্তাকে শ্রদ্ধা করে এবং সকল মানুষকে সমান মনে করে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করে, তারা যে দেশের মানুষ হোক না কেন, আমি তাদের নিজের ভাই বলে মনে করি এবং তাদের সঙ্গে একত্রে পান-ভোজনে আগ্রহী।

"যদি কোন শূদ্র বা অতিশূদ্র ভাই, যে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে এবং যে ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, এরূপ কোন সংবাদ পেলে বা তাদের নিকট থেকে কোন পত্র পেলে তাদের অভিনন্দন জানাব এবং তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাব এবং তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

—জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে, পুনা, ওল্ডগঞ্জ নং ৫২৭; তাং ৫।১২।১৮৭২

জ্যোতিরাওএর এই পত্রের জবাবে মারাঠি সাংবাদিকরা জানায় যে, জ্যোতিরাওএর পত্রে হিন্দুদের ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যেভাবে

নিন্দাবাদ করা হয়েছে তাতে তাদের পক্ষে উক্ত পত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোলাপুর থেকে প্রকাশিত মিশনারীদের 'মিরর' পত্রিকায় ১।২।১৮৭৩ তারিখে জ্যোতিরাওএর এই পত্রখানি সপ্রশংস মন্তব্যসহ প্রকাশ করা হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের সম্পর্কে একটি কাব্যগাঁথা

এরপর জ্যোতিরাও একটি কাব্যগাঁথার মাধ্যমে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত চাকুরীগুলি ব্রাহ্মণরা কি ভাবে দখল করে শূদ্র শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করছে তার সজীব বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের 'লুঠেরা' ছাড়া অন্য কোন অভিধায় ভূষিত করা যায় না। এরা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে ভিক্ষার নামে শূদ্র ও অতিশূদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের নির্মমভাবে লুণ্ঠন করত। ব্রাহ্মণরা তাদের তৈরী শাস্ত্রগ্রন্থে দৈহিক শ্রমমূলক কাজকে নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের মানুষের কাজ বলে বর্ণনা করেছে। ফলে তারা দৈহিক শ্রমমূলক কাজকে ঘৃণা করে সরকারী অফিসের কেরাণীর চাকুরী-গুলি একচেটিয়া দখল করে নেয় এবং প্রকাশ্য দিবালোকে কলমের মারপ্যাচ গ্রামের কৃষক ও কনসট্রাকশনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নানা অছিলায় লুণ্ঠন করতে থাকে। ব্রাহ্মণ অফিসাররা সরেজমিনে হাজিরা খাতা নিয়ে কর্মস্থলে গিয়ে হাজির হয়। যে শ্রমিকরা সারা মাস কাজ করছে হাজিরা খাতায় তাদের কারো ১০ দিন, কারো ১৫ দিন, কারো ২০ দিন কাজ দেখিয়ে বাকী ২০, ১৫, ১০ দিন অনুপস্থিত দেখিয়ে তাদের বেতন থেকে প্রচুর পরিমান টাকা আত্মসাৎ করে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। শ্রমিকরা সারাদিন রোদে-জলে, কঠোর পরিশ্রম করেও তাদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত হয়, আর ব্রাহ্মণ অফিসার, কর্মচারী ও কেরাণীরা আরামে ঘরে বসে ও মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে কাজের তদারকী করে যেমন মোটা বেতন পকেটস্থ করে, তেমনি শ্রমিকদের বঞ্চনা করে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করে।

শুধু তাই নয় তারা শ্রমিকদের তাদের বাড়ীতে সকালে ও রাত্রে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেয়। কৃষকদের জমির ফসল বিনামূল্যে জোর করে নিয়ে নেয়। মেয়ে শ্রমিকদের দিয়া তাদের বাড়ীর নোংরা পরিষ্কার করায়। তাদের দিয়ে পা ও গা টিপিয়ে নেয়। তাদের ছেলেমেয়েদের দিয়েও কাজ করিয়ে নেয়। এমনও দেখা গেছে যে সারা মাস খাটিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের বেতন দেয়। তাদের গরুর গাড়ী সারা মাস খাটিয়ে ১০।১২ দিনেরও মজুরী দেয় না। যারা এর প্রতিবাদ করে তাদের মাসের পর মাস কাজ থেকে বসিয়ে দেয়। যে সব মেয়েরা সুপারভাইজারদের প্রিয় হতে পারে তাদের তারা পুরো মাসের মাহিনা দেয়।

ব্রাহ্মণগণ ধর্মের নাম করে তাদের বলে, তোমরা আগের জন্ম বহু পাপ করেছ, তাই এই জন্মে শূদ্র ও অতিশূদ্র হয়ে জন্মেছ। এই জন্মে ব্রাহ্মণদের সেবা করলে পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। আগের জন্মে বহু পুণ্যকাজ করে তারা এজন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লাভ করেছে। তাই ব্রাহ্মণরা হল মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্যবান। তাদের সেবা করলেই তোমাদের পুণ্য সঞ্চয় হবে। এইভাবে মিথ্যা কথা প্রচার করে ও মিথ্যা শাস্ত্রগ্রন্থ তৈরী করে ব্রাহ্মণরা শূদ্র ও অতিশূদ্রদের নির্মমভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করছে।

এই সব ব্রাহ্মণ অফিসার ও সুপারভাইজাররা তাদের ঊর্ধতন ইংরেজ অফিসারদের নানাভাবে খুশী রাখে। তারা মাঝে মাঝে ইংরেজ অফিসারদের অতি উপাদেয় ভোজ দেয় এবং তাদের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট জমা দেয়। ব্রাহ্মণ কেরাণীরা মনগড়া কাল্পনিক ভাউচার তৈরী করে মিথ্যা রিপোর্ট বানাতে খুব ওস্তাদ। এই ভাবে মিথ্যা ভাউচার পেশ করে তারা সেই সস্তার বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল থেকে লুঠ করত। এই ভাবে সরকারী ফাণ্ড নিঃশেষ হলে সরকার নূতন করে কৃষকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করত। ফলে কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ বেড়ে যেত। সরকার যখন ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের দুষ্কৃতির কথা জানতে পারত এবং তাদের দুষ্কর্মের প্রমাণ পাওয়া যেত, তখন দুষ্কৃতিকারী ব্রাহ্মণ কর্ম-চারীরা পদত্যাগ করে শাস্তি এড়িয়ে যেত।

একারণে জ্যোতিরাও প্রস্তাব করেন যে ব্রাহ্মণদের দুর্নীতি ও অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র পথ হল সরকারী অফিসে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মচারী ও অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা। সরকারী অফিসে সর্বস্তরে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য থাকার ফলে জাতিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন করে থাকে। ফলে তাদের দুর্নীতির গোলক-বাঁধায় ইংরেজ প্রশাসকগণ প্রবেশ করতে সক্ষম হন না। তাই, যদি বিভিন্ন জাতি-বর্ণ থেকে আনুপাতিকহারে কর্মচারী নিয়োগ করা যায়—বিশেষত জাতিগতভাবে শ্রমপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান শূদ্র ও অতিশূদ্ররা বেশী পরিমানে চাকুরীতে নিযুক্ত হতে পারে, তবে সরকারী প্রশাসন যেমন যোগ্যতর হয়ে উঠবে, তেমনি দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা এবং শ্রমজীবী শ্রমিক ও কৃষকদের উপর নির্মমভাবে শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটবে। তাহলে বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণ শাসনের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। জ্যোতিরাওএর এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণ নীতির নৈতিক ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল।

আরো ৩টি অভং (কবিতা)

২। সুদখোর মাড়োয়ারী ও ভাট (ব্রাহ্মণ) দের শঠতা

দরিদ্র শূদ্র কৃষকরা কোমরে একফালি কাপড় জড়িয়ে সারাদিন মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে। তাদের বৌদের একমাত্র সম্বল হল ছিন্ন কম্বল। তাদের সন্তানরা সারা দিন মাঠে গরুমোষ চরায়। গরুর দুধই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

শয্যা বলতে তাদের কিছুই নেই। একে অন্যের গায়ে গায়ে জড়িয়ে তারা শীতের রাত কাটায়। কুলকার্নি'রা জমির খাজনার নাম করে নানাভাবে তাদের তাড়না করে। শেষ পর্যন্ত তারা গিয়ে মাড়োয়ারী সুদখোর ঋণদাতাদের খপ্পরে পড়ে। তারা অজ্ঞ কৃষকদের বণ্ড সই করিয়ে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। উকিলরা অহেতুক বেশী করে ফি নেয়। বিচারকরাও তাদের বিরুদ্ধে নির্দয় রায় দেয়। সকলেই দলবদ্ধভাবে কৃষকদের ঠকায়।

বৃটিশ সরকার গর্ব করে যে, তারা ন্যায়পরায়ণ। শেষ পর্যন্ত তারাও কৃষকদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কৃষকদের নিকট থেকে টাকায় ১ আনা শিক্ষা সেচ আদায় করে বটে; কিন্তু কৃষকদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পায় না। এই নিন্দাবাণী জ্যোতিরাও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছেন।

৩। ব্রাহ্মণদের কৃত্রিম, ধূর্ত এবং শঠতাপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ

অলস ব্রাহ্মণরা আরামদায়ক লেপ গায়ে দিয়ে কোমল শয্যায় গড়াগড়ি দিচ্ছে; আর দরিদ্র কৃষকরা তাদের জমির সীমানায় খালি গায়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। তারা ভোরে উঠে তাদের চাষের গরুকে খেতে দিচ্ছে; আর ব্রাহ্মণরা ভোরে উঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রাতঃস্নান করছে। ব্রাহ্মণরা জুতা পায়ে ভাঁজ করা ধুতি পরে মাথায় লাল রঙের পাগড়ী পরছে; আর শূদ্ররা কোমরে একখানি কাপড় জড়িয়ে মাথায় মোটা ছেঁড়া কম্বল পরছে। ব্রাহ্মণরা উপাদেয় মূল্যবান খাদ্য খেয়ে তৃপ্তিলাভ করছে। দারিদ্র কৃষকরা দুধ ও পনির খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ব্রাহ্মণরা তাকিয়ার ঠেস দিয়ে হিসাবের খাতা লিখছে; আর কৃষকরা খালি পায়ে মাঠে চাষ করছে এবং গান গেয়ে মোষ নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছে। ব্রাহ্মণরা উপাদেয় খাদ্য খেয়ে কোমল বিছানায় আরামে ঘুমাচ্ছে; আর কৃষকরা খৈনী মুখে দিয়ে মোটা কাঁথা গায়ে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

একই ভারত মাতার সন্তান হয়ে এক জন বিলাসিতার মধ্যে আরামে দিন কাটাচ্ছে; আর একজন অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। সোমরসপায়ী ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করল; শূদ্রেরা নীরবে তাদের নির্দেশ পালন করে যুগ যুগ ধরে অজ্ঞতার অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে। মনুস্মৃতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ইংরেজী ভাষা আমাদের ধাত্রী-মাতারূপে শিক্ষার পীযূষ ধারা পান করাচ্ছে। জ্যোতিরাও-এর উদাত্ত বাণী হল, 'হে শূদ্র ভাইগণ, এগিয়ে এস; অভিশপ্ত মনুর বিধানকে চিরতরে বর্জন করে শিক্ষা লাভ কর এবং সুখী হও।'

৪। ব্রাহ্মণদের শঠতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন শূদ্রগণ

ব্রাহ্মণরা জনসাধারণের হিতার্থে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে শুষ্ক চক্ষু মোছার ভান করে। তারা আসলে সার্কাস পার্টির জোকার ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যামান এবং সব কিছুই দেখছেন। ঈশ্বরের কোন দালালের প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণরা দালাল সেজে ঝুটিওয়ালা মোরগের ন্যায় সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা অজ্ঞ শূদ্রদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়ে নানা গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছে ; আর পূজার নাম করে জনসাধারণকে শোষণের কারবার চালাচ্ছে।

ঈশ্বর একমাত্র ন্যায় বিচারক। তার বিচারক্ষেত্রে কোন উকিলের দরকার নেই। ভণ্ড ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের পরিত্রাতা সেজে তাদের গাঁজাখুরি মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে ধর্মের নামে প্রতারণা করছে। জ্যোতিরাও এর সার কথা হল, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, তিনিই একমাত্র ন্যায় বিচারক।'

* এখানেই গোলামগিরির সমাপ্ত *

———

সত্যশোধক সমাজ

গোলামগিরি গ্রন্থটি প্রকাশের পর তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জ্যোতিরাও তাঁর গুণমুগ্ধ অনুগামীদের নিয়ে পুণায় একটি সভা আহ্বান করলেন। মহারাষ্ট্রের সকল অঞ্চল হতে প্রায় ষাটজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও চিন্তাবিদ সেই সভায় যোগদান করেন। শূদ্রজাতির কল্যাণে জ্যোতিরাও এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'সত্যশোধক সমাজ'। জ্যোতিরাও এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হলেন। প্রতি রবিবার, সাপ্তাহিক সভা বসত। এর আলোচ্য বিষয় ছিল সংযত আচার, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, ব্রাহ্মণ বিহীন বিবাহব্যবস্থা, জ্যোতিষ, ভূত, কল্পিত দেবদানবের ভীতি হতে মানুষকে মুক্ত করা ; প্রধান আক্রমণ ছিল জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে।

ব্রাহ্মণগণ সত্যশোধক সমাজের সভ্য না হবার জন্য গ্রামবাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করল, যারা সভ্য হয়েছিলেন তাদের প্রতি সামাজিক নিপীড়ন আরম্ভ হল। এই বলে শূদ্রদের ভয় দেখান হল যে, তারা যদি ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজাপার্বণাদি সম্পন্ন করে তবে ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের অভিশাপে তাদের পরিবার ধ্বংস হবে। জ্যোতিরাও বেদের কোন ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। কোরাণ, বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থকে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মানেন নাই। ঐগুলি সবই মানুষের রচিত রচিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

'সত্যশোধক সমাজ' বর্তমান ভারতের সামাজিক আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। সামাজিক দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগঠন সোচ্চার হয়েছিল। দীর্ঘদিনের নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল এই প্রতিষ্ঠান।

জ্যোতিরাওএর একজন আত্মীয় তাঁর দোকানে কাজ করতেন। ছেলেটি যুবক, নিরক্ষর এবং বিপত্নীক। জ্যোতিরাও তাঁকে অবসর

সময়ে লেখাপড়া শেখাতেন। কিছুদিন বাদে তাঁর বিবাহ স্থির হল সত্যশোধক সমাজের নীতিপদ্ধতি অনুসারে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ ও ভগবানের আশীর্বাদশূন্য বিবাহ, সমাজের পক্ষে অপমানজনক এবং অধর্ম— এই কথা বলে তারা কন্যার পিতাকে ভয় দেখালেন। কিন্তু কন্যার মাতা ছিলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলের বন্ধু; তাই কোন প্রতিরোধ কার্যকরী হল না। ১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মণহীন বিবাহ অনুষ্ঠান হল মাত্র পান সুপারীর খরচায়। জ্যোতিরাও রচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে বর ও কনের আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল কেবলমাত্র অনুষ্ঠান বিধি। সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮৭৬ সালে 'সত্যশোধক সমাজে'র বার্ষিক কার্য বিবরণী মহারাষ্ট্রের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তা দেশের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু বিষয়টি অনেকেই ভাল দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই সময়ে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও মর্যাদা রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন বীরত্ব ও পাণ্ডিত্বে অহঙ্কারী এক পণ্ডিত—বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর। অতীতের পেশোয়া শাসনের প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ আনুগত্য। যোগত্যাসম্পন্ন শক্তিমান লেখক চিপলুনকর, শিক্ষিত যুবকদের জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধক ভাবনা চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর লেখনী-শক্তির উৎস ভারতের অতীত গৌরব। তিনি লেখার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, সত্যশোধক সমাজ তথা জ্যোতিরাওকে তীব্র আক্রমণ করেন।

অন্যদিকে সেই সময় কৃষ্ণরাও ভালেকর নামে এক তেজস্বী যুবক ১৮৭৭ সালে 'দীনবন্ধু' নামে একটি মারাঠী পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সত্যশোধক সমাজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কৃষক, শ্রমিক ও দরিদ্রদের ব্যথা বেদনার সপক্ষে জোরালো ভাষায় লেখনী ধরলেন। তিনি পরোক্ষে জ্যোতিরাওকে সমর্থন করে চিপলুনকরকে আক্রমণ করেন। সত্যশোধক সমাজের সমর্থক ও কর্মীরা বিশ্বাস করতেন ইংরাজ শাসন ঈশ্বরের বিধান; কারণ ইংরাজ শাসনেই তাঁরা শিক্ষার সুযোগ ও মানবিক অধিকার ফিরে পেয়েছেন।

এই সমাজের সমর্থক বা সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানার্থে জ্যোতিরাও সমাজের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনাচক্র বসিয়েছিলেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা দারিদ্র্য দূরীকরণের পন্থা বিষয়ক আলোচনার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান হত।

অনাবৃষ্টি অথবা অল্পবৃষ্টির ফলে মহারাষ্ট্রে বারবার দুর্যোগ ঘটত; দুর্ভিক্ষ অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যেত। জ্যোতিরাও 'দীনবন্ধু' পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের খাদ্য ও কাজ দেবার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিষ্পাপ শিশুদের ভয়াবহ মৃত্যুতে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। সত্যশোধক সমাজের উদ্যোগে তিনি ভিক্টোরিয়া বালাশ্রম নামে ধনকাণ্ডীতে একটি অনাথ আশ্রম খুললেন। সেখানে দুই বৎসর হতে বারো বৎসর বয়সের দুই হাজার শিশুকে সকালে ও সন্ধ্যায় রুটি দেওয়া হত।

পুনা মিউনিসিপালিটির সদস্য জ্যোতিরাও

পুণা মিউনিসিপালিটিতে নিম্নশ্রেণীর সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাদের জল সরবরাহাদির প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি দেওয়া হত না ; তাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। জল, আলো, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কেবল উচ্চবর্ণের লোকেরা ভোগ করত। এই অসাম্যমূলক কার্যকলাপের প্রতিকারার্থে জ্যোতিরাও আন্দোলন শুরু করেন। অবশেষে সরকার পুণা মিউনিসিপাল কমিটিতে জ্যোতিরাওকে মনোনীত সদস্য বা কমিশনার হিসাবে গ্রহণ করে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে কমিশনার হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

পুণা মিউনিসিপালিটির সদস্যদের মধ্যে জ্যোতিরাও অত্যন্ত কর্মঠ লোক ছিলেন। ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে যখন পরবর্তী বৎসরের বাজেট বিষয়ক আলোচনা হচ্ছিল, তখন জ্যোতিরাও প্রস্তাব দিলেন পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে একজন কেরাণী নিয়োগ না করে ত্রিশ টাকা ও কুড়ি টাকার মাসিক বেতনে দুইজন কেরাণীকে নিয়োগ করা হোক, তাতে বেকার সমস্যা একটু কমবে। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও প্রস্তাব নির্বিবাদে গৃহীত হয়েছিল। অল্পদিন পরেই হিসাব পরীক্ষার সাব কমিটির সদস্য রূপে জ্যোতিরাও মনোনীত হন। তিনি মিউনিসিপালিটির নানাবিধ গঠনমূলক পরিকল্পনায় দায়িত্ব পেয়ে কাজে গভীর মনোযোগ দিলেন। তিনি 'দীনবন্ধু' পত্রিকায় সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং তাঁর সহযোগী বন্ধুরা সেই সব পত্রিকা গ্রাম ও শহরে প্রচার করতেন। ১৮৮০ সালের প্রথম দিকে এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রবন্ধে তিনি অতি সত্বর বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার দাবি জানান। লেখনীর মাধ্যমে তিনি সরকারের কাছে কৃষকদের জন্য ভাল বীজ, যন্ত্রপাতি, সার বণ্টনের দাবি জানাতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।

মিউনিসিপালিটির সদস্য হিসাবে জ্যোতিরাও গরীবদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সব থেকে বেশী সচেতন ছিলেন। ১৮৮০ সালে

পুণা মিউনিসিপালিটির ভেটালপেটে, একটি সব্জীর বাজার খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জ্যোতিরাও তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব রাখেন যে, বাজারের জন্য টাকা মঞ্জুর হোক ; কিন্তু ঘরভাড়া বাবদ কোন দোকানীর কাছ থেকে মাসিক চার আনার বেশী খাজনা আদায় করা চলবে না।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের পরিদর্শন উপলক্ষে মিউনিসিপালিটির আর্থিক দায়িত্বে নগর সুসজ্জিত করার পরিকল্পনা যখন গৃহীত হয়, ছত্রিশজন সদস্যের মধ্যে জ্যোতিরাও একা তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন সাময়িক রাজ সম্মানে নগর সজ্জিত করার খরচ বাঁচিয়ে সেই অর্থে গরিবদের শিক্ষার ব্যবস্থা হোক।

এর কিছুদিন বাদে সরকারের সঙ্গে জ্যোতিরাও এর মতান্তর ঘটল। মদের অবৈধ কারবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুণায় অনেকগুলি নতুন মদের দোকানকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়। জ্যোতিরাও মদ্যপান বিরোধী হওয়ায় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে ১৮৮০ সালের ১৮ জুলাই মিউনিসিপালিটির সভাপতিকে লিখলেন—"নগরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পুণা মিউনিসিপালিটির অনেক ব্যয়ভার বহন করতে হয় এবং তা কর্ত্তব্যও বটে ; অথচ যার পরিণতি মারাত্মক ব্যাধি এবং মৃত্যু, সেই মদের দোকান শহরের সর্বত্র খোলা হচ্ছে ! আমি মনে করি এই মদের দোকান কেবল অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না, চরিত্রেরও ক্ষতি করবে। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং শুঁড়িখানা হবে পাপের আড্ডাখানা। অতএব নতুন মদের দোকান খোলা বন্ধ হোক এবং যারা আগে থেকে এই ব্যবসা করছে তাদের প্রতি অত্যধিক আর্থিক ট্যাক্স ধার্য হোক্।"

জ্যোতিরাও এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মকুশলতার খবর তখন মহারাষ্ট্রের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্য অনেক স্থান থেকে আমন্ত্রণ আসছিল ; কেন না তাঁর কণ্ঠস্বরে সর্বহারা দরিদ্র জনগণের দুঃখ ব্যক্ত হয়েছিল। এ যাবৎকাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নশ্রেণীর কোন সহৃদয় ব্যক্তি এমন বজ্রনির্ঘোষে ও উদাত্ত কণ্ঠে—সামাজিক বৈষম্য, অন্যায়, অবিচার, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। জ্যোতিরাও

তাঁর বক্তব্যে গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের জড়তা ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করে পরিশ্রমী ও সংগ্রামী হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল গ্রামজীবনে পরিবর্তন আনা। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে। কৃষকদের নতুন কৃষি-পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও ঋণমুক্ত করা, সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদ ও পৌরোহিত্য প্রথার বিলোপ এবং যে কোন প্রকার নেশা বা মদ্য পানের বিরুদ্ধে সংযত চরিত্র গঠন।

জ্যোতিরাও এর এই শুভ ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধে সমাজের সুবিধাবাদী ধনী ও পুরোহিত শ্রেণী তাঁকে অহর্নিশ গালি দিত।

হাণ্টার কমিশনে জ্যোতিরাওএর প্রতিবেদন

১৮৮২ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন সারা ভারত ভ্রমণ করছিল। এর প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের নামে এই কমিশনের নাম হয় 'হাণ্টার কমিশন'। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল, তদনুসারে ঐ কমিটি প্রত্যেক প্রদেশের সমস্যা অনুসন্ধান করে ও সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

জ্যোতিরাও এই কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তিনি বলেন—সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার নির্লজ্জ বিধান হচ্ছে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে উচ্চ কর্মচারীদের একাধিপত্য। সরকার যদি শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি দমন ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে চান তবে ব্রাহ্মণদের প্রধান্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে অন্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও এই সরকারী চাকরীগুলি ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, বম্বে প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হচ্ছে। এই প্রদেশের দশ ভাগের নয় ভাগ গ্রামে প্রায় দশ লক্ষ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্যবশতঃ ছেলেদের স্কুলে পাঠায় না। তাদের গরু চরাতে হয় অথবা মাঠে কাজ করতে হয়।

জ্যোতিরাও প্রস্তাব রাখেন, প্রাথমিক শিক্ষা বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষক বা দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্রদের বৃত্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্হা করা হোক। যেখানে মাহার, মঙ ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের সংখ্যা বেশী, সেখানে তাদের জন্য আলাদা স্কুল খোলা হোক; কেন না সাধারণ স্কুলে উচ্চবর্ণের ছেলেদের সঙ্গে তাদের বসতে দেওয়া হয় না।

এছাড়াও তিনি আরো বলেন—বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত অধিকাংশ শিক্ষকই যথোপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা বাস্তব জ্ঞানশূন্য ও অকর্মণ্য হয়। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষকগণ উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কৃষক শ্রেণীভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ তাঁরা অবাধে সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ও তাদের অভাব

অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষা জানতে পারবেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ নিম্নবর্ণের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বা মিশতে চান না। প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন বিভাগের কাজকর্ম ত্রুটিপূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। তিনি প্রস্তাব রাখেন, যেহেতু ইনস্পেক্টর বছরে মাত্র একবার স্কুল পরিদর্শন করেন, তাতে শিক্ষকদের কোন ভীতি থাকে না। তাই বছরে অন্ততঃ তিনবার স্কুল পরিদর্শন করতে হবে এবং তাও আকস্মিকভাবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে আগের থেকে সংবাদ দিয়ে আসা চলবে না।

সবশেষে তিনি কমিশনের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, সমাজে যে সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আদৌ ঘটে নি, তাদের জন্যে সরকারী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার জন্য উদার হস্তে অর্থ মঞ্জুর করতে হবে।

———
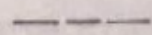
কৃষকদের চাবুক এবং আরো কয়েকখানি পুস্তক

১৮৮৩ সালের প্রথম দিকে জ্যোতিরাও শূদ্রদের স্বার্থে 'কৃষকদের চাবুক' (Cultivator's Whipcord) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকটির একটি কপি বরোদার মহারাজাকে এবং একটি কপি ভারতের গভর্ণর জেনারেল স্যার ফ্রেডারিক টেমপলকে পাঠান। এই পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি উল্লেখ করেছেন —

শিক্ষার অভাবে বুদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়,
বুদ্ধির অভাবে নৈতিকতা নষ্ট হয়,
নৈতিকতার অভাবে উন্নতি থেমে যায়,
উন্নতির অভাবে ধন বিলুপ্ত হয়,
অর্থের অভাবে শূদ্রগণ ধ্বংস হয়,
সমস্ত দুঃখ নিরক্ষরতা হতে উৎপন্ন হয়।

এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি উল্লেখ করেছেন— কি ভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, শূদ্র সমাজকে শিশু-দোলনা হতে শ্মশান পর্যন্ত, গর্ভবাস হতে তীর্থক্ষেত্র পর্যন্ত বিভিন্ন কুসংস্কার, ধর্মের আবরণ ও পূজাপার্বণাদির মাধ্যমে শোষণ করে বেঁচে থাকে। এই ব্রাহ্মণরা উচ্চ শিক্ষালাভ করে নাই, ভণ্ড সাধুর জীবন যাপন করে এবং এই সব অজ্ঞ, দরিদ্র, নিরক্ষর জনগণের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তারা তাদের সংস্কৃত পাঠশালায় কৃষক ও নিম্নবর্ণের ছেলেদের পড়বার সুযোগ দেয় নাই।

দ্বিতীয় বাজীরাও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতিপালন করতেন। যে দরিদ্র কৃষকদের নিকট হতে তাঁর রাজস্বের অধিকাংশ সংগ্রহ হত, তাদের পরিবার ও ছেলে মেয়েদের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন, কোন দায়িত্ব পালন করতেন না; অথচ ব্রাহ্মণদের বৃত্তি দানের বেলায় ছিলেন উদার। সরকারী অফিস, আদালতে যে কেরাণী ও কর্মচারীরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল, তাদের চরিত্র ছিল অসৎ, তারা সহজ সরল নিরক্ষর কৃষকদের আবেদন, সাক্ষ্য ও দলিল বিকৃত করে যারা ঘুষ দিত তাঁদের পক্ষে রায় দিত। তিনি বলেছেন—বৌদ্ধধর্ম সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শোষণ থেকে রক্ষা করেছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে

শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণদের স্বার্থে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চালু করেছেন।

জ্যোতিরাও ঐ পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন জ্ঞান ও বীরত্ব কোন বিশেষ বংশ বা গোত্রের একচেটিয়া জিনিস নয়; কারণ একই পিতা মাতার দুই পুত্র একই গুণবিশিষ্ট হয় না। একজন হতে পারে মূর্খ; অন্যজন জ্ঞানী ও সাহসী। তাঁর মতে পিতা মাতার মিলনের সময় তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর সন্তানের গুণাদি নির্ভর করে। তা ছাড়া শিশুর বুদ্ধি নির্ভর করে পরিবেশ ও আবহাওয়ার উপর। সেহেতু অনেক সময় দুর্লভ প্রতিভাসম্পন্ন বা অত্যুন্নত মহৎ ব্যক্তিও সাধারণ কৃষক, মুচী বা মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজনে জ্যোতিরাও নিম্নবর্ণের ছেলেদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক ছাত্রাবাসে থাকা, খাওয়া-পরা ও স্কুলে পড়ার সুযোগ দানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

তিনি আরও প্রস্তাব রাখেন কৃষকদের জমির উপর ন্যায়সঙ্গত খাজনা ধার্য হোক। তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে, যাতে তারা ঋণ মুক্ত হতে পারে। ধর্মীয় ভাবে কৃষক ও দরিদ্র শ্রমিকরা যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদের চক্রান্তে আবদ্ধ হয়ে পুরোহিতের পা ধোয়া জল খাওয়া, গরু, মহিষ, ভূত, প্রেত, বটবৃক্ষ বা তুলসী পুজো প্রভৃতি থেকে বিরত হয়, সে বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞানদান করতে হবে।

ব্রাহ্মণ জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে কৃষকগণ এক বৎসর জমি চাষ করতে অস্বীকার করলেন এবং সরকারের কাছে নালিশ জানালেন। জ্যোতিরাও কৃষকদের সপক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন।

জ্যোতিরাওএর সঙ্গে সরকারী কর্মচারী, জমিদার ও মহাজনগণ মীমাংসায় এলে জমির উপর আন্দোলন প্রত্যাহার হল।

১৮৮৪ সালে জ্যোতিরাও 'দীনবন্ধু' পত্রিকায় বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড় এর কাছে কবিতার ছন্দে একখানি খোলা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি সয়াজিরাওকে শূদ্রদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য অনুনয় করেন। তিনি লেখেন—ব্রাহ্মণগণ তাঁদের

শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দুর্বল ও চরম দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। যে কৃষক মাঠে কাজ করে তাদের অভুক্ত রেখে রাজস্ব হতে অলস ব্রাহ্মণদের বৃত্তি দেওয়া ঠিক নয়। দেশের শ্রমজীবী কৃষকসমাজ কায়িক পরিশ্রম করে জমিদার ও মহাজনের কোষাগার পূর্ণ করে ; আর তারা নিজেরা আধপেট খেয়ে দুর্বহ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনক্রমে জীবন নির্বাহ করে। দেশের সর্বময় কর্তা যিনি তাঁর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব, নিরক্ষর কৃষক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা।

এই চিঠির জন্য ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জ্যোতিরাও বরোদায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জ্যোতিরাওএর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা, দৃঢ় চরিত্র, নিঃস্বার্থপরতা, অস্পৃশ্য ও দরিদ্র মানুষের জন্য অসীম দরদ, মহারাজ সয়াজিরাওএর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি জ্যোতিরাও এর মনোজ্ঞ বক্তৃতা শুনে খুশী হন।

এর ফলে জ্যোতিরাও বরোদার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ পান।

১৮৮৫ সালের ২৪ মে পুণায় সার্বজনিক হলে মারাঠী লেখকদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। এর সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণ-শাস্ত্রী রাজওয়াদে। প্রায় তিনশত লেখক এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। যে সকল লেখক সভায় যোগ দিতে পারেন নাই তাদের লিখিত অভিভাষণ সভায় পঠিত হয়। ৪৩ জন অনুপস্থিত লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম জ্যোতিরাওএর লিখিত পত্রই সভায় পাঠ হয়।

ঐ সভায় যোগদানের জন্য এম. জি. রাণাডে জ্যোতিরাওকে আমন্ত্রণ জানান ; কিন্তু জ্যোাতরাও ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে রাণাডেকে পত্র লেখেন—

"আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি ; কিন্তু ভাই, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও পুস্তকাবলীর মতবাদের সঙ্গে আপনাদের লেখকগণ একমত নন। ইচ্ছাক্রমে পরোক্ষ বা প্রকাশ্যে তাঁরা নিম্ন-বর্ণের মানুষদের মানবিক অধিকার দিতে নারাজ। তাঁদের শিক্ষা ও বাণী আমাদের মতবাদ থেকে আলাদা। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ শূদ্র ও অতিশূদ্রদের প্রতি হিংসা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের লেখায়

এদের দাস আখ্যা দিয়েছেন। শুধু বর্তমান শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, অনেক ঐতিহাসিক প্রাচীন লিপিও সেই সাক্ষ্য বহন করে। যে দুঃখ যন্ত্রণা শূদ্র ও অতিশূদ্রগণ যুগ যুগ ধরে ভোগ করে আসছে ঐ সব জ্ঞানাভিমানী লেখকগণ, যারা অর্থহীন বক্তৃতা দান করেন, তাঁরা তা ধারণাই করতে পারবেন না।

আমরা অস্পৃশ্য শূদ্রগণ, উচুবর্ণের কোন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না। ওদের সঙ্গে মিশে আমাদের কোন লাভ নাই। আমাদের নিজেদের চিন্তা নিজেরাই করব এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব। আপনাদের ঐসব বিদগ্ধ লেখকগণের যদি জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করার সদিচ্ছা থাকে, তবে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করে কি ভাবে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা প্রকাশ করতে বলুন। শিল্প ও সৌন্দর্য সৃষ্টির নামে সমাজের প্রকৃত ক্ষতকে আবৃত না রেখে তা নির্মূল করাই সঙ্গত।

এই আমার সার কথা। আমার এই সংক্ষিপ্ত পত্র আপনার সভায় আলোচনার জন্য পাঠালে খুশী হব।"

মহারাষ্ট্রের উচ্চবর্ণের লেখক ও সম্পাদকগণ জ্যোতিরাওএর এই চিঠিতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন ; তবু জ্যোতিরাও তৎকালীন মারাঠী লেখকদের সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টি করতে চান নি। কেন না তাঁদের লিখিত কাব্য, কবিতা, নাটক, নভেল বা গল্পে এই নিরক্ষর দরিদ্র বিশাল শূদ্র সমাজের কোন বেদনার কথা প্রতিফলিত হয় নি।

জ্যোতিরাও অস্পৃশ্যদের জীবন, জীবিকা ও ব্যথাবেদনার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন অস্পৃশ্য এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতেন, এবং অবহেলিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। তাদের মধ্যে তিনি নেতা সৃষ্টি করতেন। বুদ্ধিমান ও উদ্যমী যুবকদের সমাজসেবায় উৎসাহ দিতেন। তাঁদের লিখতে ও বলতে প্রেরণা যোগাতেন। এই ভাবে গোপালবাবা পয়ালাঙ্কার নামে একজন যুবককে অস্পৃশ্য সমাজের প্রভাবশালী কর্মী ও নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন, আকর্ষণীয়

প্রবন্ধও লিখতেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তাঁর মাধ্যমে অস্পৃশ্য সমাজের উন্নতির জন্য কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল।

বম্বের গভর্ণর 'লর্ড রে' এর নামানুসারে ১৮৮৫ সালে পুণায় একটি উন্নতমানের নতুন বাজার প্রতিষ্ঠিত হল। এই বাজারে ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স ধার্য হল অত্যধিক। গ্রামের দরিদ্র, দুস্থ সব্জি বিক্রেতারা সেই বাজারে দোকান খুলতে পারলেন না। কর্তৃপক্ষের নিকট জ্যোতিরাও প্রতিবাদ জানালেন—যেখানে গরীব মানুষ ক্রয় বিক্রয় করতে অক্ষম, তেমন বাজারের দরকার নাই। লক্ষ টাকা ব্যয় করে উন্নতমানের বাজার প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে দেশের গরীব মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। তিনি কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—গ্রামের সব্জি বিক্রেতারা এতই গরীব যে তারা প্রতিদিন মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা করেন। পরিশ্রম অনুসারে যৎসামান্য লাভে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। এই বাজারে তাদের কাছ থেকে কোনপ্রকার ট্যাক্স বা খাজনা যেন না নেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ জ্যোতিরাও এর এই অনুরোধ ও সুপারিশ রক্ষা না করলেও দেশের গরীব মেহনতি মানুষ তাদের দরদী বান্ধব জ্যোতিরাওএর সহৃদয়তা ও ভালবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ভুল করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে পুণার সেই 'নিউ মার্কেট' 'মহাত্মা ফুলে মার্কেট' নামে পরিচিত হয়েছে।

১৮৮৫ সালের বর্ষাকালে সয়াজিরাও গাইকোয়াড় যখন পুণায় অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর সম্মানার্থে জ্যোতিরাও ও তাঁর অনুগামীগণ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে এম. জি. রাণাডে ও ডঃ ভাণ্ডারকরকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। জ্যোতিরাও ও অন্যান্য কয়েকজন 'সত্যশোধক সমাজ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রাণাডে বলেন—সমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকা সত্বেও অগ্রগতির পথে বাধা হয় নি। 'দীনপ্রকাশ' পত্রিকা রাণাডের প্রশংসা ও জ্যোতিরাও এর বক্তব্যের একদেশদর্শিতা প্রকাশ করে। এক মাসের মধ্যেই জ্যোতিরাও একখানি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে 'রানাডে' ও 'দীনপ্রকাশে'র আক্রমণের জবাব দেন। পুস্তিকার

নাম দেন 'হুশিয়ার'। তার কিছুদিন পরে 'সত্যসার' নামে আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি 'প্রার্থনা সমাজ' ও 'ব্রাহ্ম সমাজ' সম্পর্কে বলেন, যদি তারা শূদ্রদের সঙ্গে মিশে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারেন, তবে সে সংগঠনে তাদের থাকা সমীচীন নয়।

জ্যোতিরাও এর অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধু থাকা সত্বেও যখন তিনি দরিদ্র অস্পৃশ্যদের নিদারুণ কষ্ট দেখতেন, তখন তাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠত। গরিবের প্রতি দরদ, ব্রাহ্মণদের প্রতি ঘৃণায় রূপান্তরিত হত ; কারণ তাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে নিরক্ষর দরিদ্র মানুষকে শোষণ করে তাদের দুর্দশার পঙ্কে নিক্ষেপ করেছে।

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জ্যোতিরাও বম্বে গেলেন এবং বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে তিনি কয়েকটি সভায় বক্তৃতা দিলেন। প্রত্যেক জায়গায় নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ দলে দলে সমবেত হলেন এবং তাঁদের নেতা জ্যোতিরাওএর মুখ থেকে অগ্নিগর্ভ, নির্ভীক বক্তৃতা শুনলেন। বক্তব্য বিষয় তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁরা জানতে পারলেন, তাঁদের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষার জন্য ঈশ্বর দায়ী নন। দায়ী এই সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। জ্যোতিরাও এর উদ্দীপ্ত ভাষণ শুনে অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণী, অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন—সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা আমৃত্যু সংগ্রাম করবেন।

অক্টোবর মাসে জ্যোতিরাও 'সত্যসার' দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখেন —সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পুরুষের লেখা, সেহেতু স্বার্থপরতাবশতঃ নারীদের সহস্র বৎসর হীনস্তরে রাখা হয়েছে। পরে তিনি অস্পৃশ্যদের সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থাকে উপজীব্য করে 'অস্পৃশ্যতার কৈফিয়ত' নামে একখানি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

জ্যোতিরাওএর জীবনাদর্শ ও লিখিত প্রবন্ধ, পুস্তকাবলী, বম্বের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা নারায়ণরাও পরমানন্দ, ওরফে মামা পরমানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জীবন সাধনায় দারিদ্র্য থেকে উন্নত অবস্থায় আরোহণ করে তিনি হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের একজন রাজনৈতিক ঋষি, পথদ্রষ্টা ও দার্শনিক। জ্যোতিরাও লিখিত 'শিবাজী' সম্পর্কে কবিতা পাঠ করে কয়েকটি

বিষয় জানবার জন্য লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। তাঁর বক্তব্যের জবাবে জ্যোতিরাও বলেন—ইংরাজ ও ইউরোপীয় লেখকগণ, এদেশের শূদ্র সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে না মিশে, ভালভাবে খোঁজখবর না নিয়ে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ লেখক ও কর্মচারীদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে ইতিহাস রচনা করেছেন। পরবর্তী কালে এদেশের উচ্চবর্ণের লেখক পণ্ডিতেরা সাহেবদের লেখা ইতিহাস অনুবাদ করে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করছেন। আজ নূতন করে ভারতের যথার্থ ইতিহাস লেখা প্রয়োজন।

তীব্র সামাজিক আন্দোলন এবং মহাত্মা উপাধি লাভ

১৮৮৫ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই এই বৎসরই প্রতিষ্ঠিত হল রাজনৈতিক ভাবালুতা প্রবণ স্বদেশী 'জাতীয় কংগ্রেস'। নবগঠিত কংগ্রেস নেতাদের জ্যোতিরাও বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছিলেন, যতদিন পার্টি মাহার, মং, কৃষক ও নিম্নসমাজের স্বার্থের প্রতি কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ না করবে, ওদের মানবিক মর্যাদা ও সম্মান না দেবে, ততদিন তাকে 'জাতীয় কংগ্রেস' বলা যাবে না। তিনি বলেন সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ নিয়ে জাতীয় 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠন করা উচিত।

'সত্যশোধক সমাজে'র লোকেরা, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাদ দিয়ে দিয়ে শুধু বিবাহ অনুষ্ঠানই নয়, অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানও সম্পন্ন করতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণদের জন্য দেওয়া দক্ষিণা, ভোজন, নতুন বস্ত্রাদি বেঁচে গেল এবং সেই উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হল।

১৮৮৭ সালের জুন মাসে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আরও ঘোরতর আকার ধারণ করল। অনুগামিদের আমন্ত্রণে জ্যোতিরাও পুণা জেলার ধামদের তেলগাও গেলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণদের বাধা সত্বেও একজন ক্ষৌরকারের বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও তাদের সমর্থক দল কুন্‌বীদের ঘুষ দিয়ে—জ্যোতিরাও এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও আক্রমণের চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ হল। কেন না সেখানে জ্যোতিরাওএর সমর্থক ছিলেন অনেক বেশী। এই ঘটনার পর তেলগাওএর ক্ষৌরকারগণ ব্রাহ্মণদের চুলদাড়ি কাটতে অস্বীকার করলেন। ব্রাহ্মণরাও কিছুদিন ক্রোধ ও অহঙ্কারে ক্ষৌরকারদের উপেক্ষা করে কাঁধে ছোট ব্যাগ নিয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে একে অন্যের চুলদাড়ি কাটতে লাগলেন।

এই হাস্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'নেটিভ ওপিনিয়ন' পত্রিকা, এক বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করে—"ব্রাহ্মণগণ যে ব্যবসা আরম্ভ করেছেন তা, কালের উপযোগীই হয়েছে। একদিন তাঁরা সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। প্রাচীন

কালে তাঁদের দুটি অস্ত্র ছিল—অভিশাপ দেবার শক্তি ও তরবারী।
কলিযুগে আবির্ভাবে প্রথমটি তাঁরা হারিয়েছেন, আর দ্বিতীয়টি
ইংরাজ দখল করেছেন। প্রবাদ আছে— যার নাই কোন কার্য, কর
সে ক্ষৌরকার্য''। সেই প্রবাদবাক্যই বাস্তবে রূপায়ণ করলেন
আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ সমাজ। তাঁরা একধারে ক্ষৌরকার ও
পুরোহিত ; আয় তাঁদের দ্বিগুণ। ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্রে
ব্রাহ্মণগণ যদি এই ব্যবসার প্রচলন করতে পারেন তবে তাঁরা ধনে
মানে সমৃদ্ধ হবেন নিশ্চয়ই।" এই নিষ্ঠুর সমালোচনায় ব্রাহ্মণ-
গণের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং তাঁরা ক্ষৌরকারদের সঙ্গে
আপস মীমাংসা করে নেয়।

১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে জ্যোতিরাও তাঁর সম্পত্তি উইল
করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন—তাঁর পালিত পুত্র যশোবন্ত
তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনা করবে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ এর
মৃত্যুর পর সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে। তাঁর উইলে তিনি
আরও প্রকাশ করেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ দাহ না করে
যেন তাঁদের নীতি অনুসারে লবন মাখিয়ে সমাধিস্থ করা হয়।
কোন ব্রাহ্মণ বা তাঁর অনুগামী যেন তাঁর মৃতদেহ স্পর্শ না করে
অথবা তাঁদের ছায়া মৃতদেহের উপর না পড়ে। সত্যশোধক
সমাজের রীতি অনুসারেই তাঁর পালিত পুত্র যশোবন্ত অন্ত্যেষ্টি
ক্রিয়ার অধিকারী হবে।

জ্যোতিরাও তাঁর পালিত পুত্রকে শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ
দিয়েছিলেন এবং তার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা
বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি যশোবন্তকে
শূদ্র মুক্তি আন্দোলনের এক জন্য সংগ্রামী সৈনিক হিসাবে গড়ে
তুলেছিলেন।

জ্যোতিরাওকে বাড়ীতে 'তাতিয়া সাহেব' বলা হত। উন্নত-
শির, গম্ভীর ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্যোতিরাও দুষ্কৃতকারীর নিকট
ছিলেন ভীতিপ্রদ। তাঁকে আক্রমণ ও অসম্মান করার জন্য শত্রুরা
সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদের ভাড়া করে রাখত। তারা ফুলের মালার
সঙ্গে বিষাক্ত পোকা মিশিয়ে সভাস্থলে তাঁর গলায় পরিয়ে দিত।

জ্যোতিরাও সব জেনেও ধৈর্য অবলম্বন করতেন। তাঁকে

ক্রোধান্বিত করার জন্য উচ্চবর্ণের মানুষ অনেক সময় পথে ঘাটে অযৌক্তিক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতেন। তিনি ধীর ও শান্তভাবে জবাব দিতেন। তাঁর অনুগামিদেরও তিনি মেজাজ ও বাক্ সংযম করতে অনুরোধ জানাতেন। যাঁরা ফুলের মালায় বৃশ্চিক দিয়ে তাঁর গলায় পারতেন তাঁদের বলতেন—"মানুষ আমার বিনাশ কামনা করলেও, বিষাক্ত জীব তা করে না।"

ব্রাহ্মণদের সংবাদপত্রগুলি 'দীনবন্ধু' পত্রিকা ও 'সত্যশোধক সমাজকে কঠোর সমালোচনা এবং তীব্রভাষায় আক্রমণ করত। ১৮৮৭ সালে ১২ জুন পুনার 'ভর্তাহার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—'দীনবন্ধু'র জন্ম হয়েছে কেবল ব্রাহ্মণদের নিন্দা করার জন্য, আর 'ভর্তাহার' এর প্রকাশ ঘটেছে 'দীনবন্ধু'র উদ্দেশ্যের অবসান ঘটাতে।

রায় বাহাদুর হরিরাওজী চিপলুনকর ১৮৮৮ সালের ২ মার্চ কনটের যুবরাজ ও রাণীর সম্মানার্থে আড়ম্বরপূর্ণ এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা, আপ্যায়ন ও সম্মানীয় অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুণা ও বম্বের বিশিষ্ট ধনী ও জ্ঞানী-ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। অনুষ্ঠানে জ্যোতিরাও আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। পাগড়ীর পরিবর্তে একখানা লম্বা কাপড় তাঁর মাথায় বাঁধা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ছোট ধুতি। গায়ে সাদা জামা, কাঁধে কম্বল, হাতে লাঠি ও পায়ে পুরাতন স্যাণ্ডেল। বেশভূষার আভিজাত্য না থাকায় তিনি প্রথমে অনুষ্ঠানে প্রবেশ অধিকার পান নি। আত্মপরিচয় দানের পর নিমন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন তাঁকে চিনতে পেরে ভিতরে নিয়ে যান।

বিশেষ আনন্দোৎসবের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হল। রাজ দম্পতির কল্যাণ কামনায় শুভেচ্ছা জানিয়ে অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। তখন কিছু বলবার জন্য জ্যোতিরাও অনুরুদ্ধ হলে তিনি যুবরাজ ও রাণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

"এই অনুষ্ঠানের আলোক ঝলমল মঞ্চসজ্জা, অতিথি ও অভ্যাগতবৃন্দের দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, মহামূল্য অলঙ্কারাদি দেখে যদি আপনারা ভাবেন, এক সুখের ভারতবর্ষ দেখছি, তাহলে

তাহলে প্রতারিত হবেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া শাসিত ভারত-বর্ষের এটা বাস্তব চিত্র নয়। আসল ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রাম। সেখান-কার মানুষের অর্থ নাই, খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই। লজ্জা নিবারণের একখণ্ড বস্ত্রও তাদের অনেকের জোটে না। সাধারণ লোকের পোশাক, আমার পোশাকের মত মলিন ও শতছিন্ন। অতএব মহামান্য যুবরাজ! যদি আপনি যথার্থই মহারাণীর প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা হলে নিকট ও দূরবর্তী গ্রামে চলুন। সেখানে অজ্ঞ লোকের সীমাহীন দারিদ্রের অভিজ্ঞতা লাভ করুন। মাহার ও মঙ পল্লীতে গিয়ে দেখুন মানুষের বাসগৃহ গোয়ালঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট—সেটাই খাঁটি ভারতবর্ষ। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে এদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করতে মহারাণীকে সদয় হতে বলুন"।

জ্যোতিরাও এর বজ্রগম্ভীর নীরস বক্তৃতায় উপস্থিত অতিথি-বৃন্দের অনেকেই অপমানবোধে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁর নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বক্তব্য শুনে যুবরাজ বিস্মিত হলেন। ভেবেছিলেন বক্তা একজন রাজদ্রোহী; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন, তিনি একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবী। যুবরাজ খুশীতে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

দরিদ্রের প্রতি জ্যোতিরাও এর অন্তর ছিল করুণায় ভরা। একদিন দুপুর বেলার ঘরে ফেরার পথে দেখেন, এক বৃদ্ধা ভিখারী পথের ধুলো-মাটি থেকে চাল কুড়াচ্ছেন। জ্যোতিরাও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল বুড়ি মা! চাল পড়ল কী করে?

বৃদ্ধা আপনমনে চাল তুলছেন আর বলছেন—আরে বাপু, পাশের বাড়ী ভিক্ষায় গেলাম। সাবিত্রী মা এতগুলো চাল দিলে; আমার এই পচা কাপড়ে তার ভার সইতে পারল না। ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

ভিখারীর প্রতি স্ত্রীর সহৃদয়তায় আনন্দ পেলেও বৃদ্ধার বস্ত্রা-ভাবের কথা ভেবে কষ্ট পেলেন জ্যোতিরাও। তিনি বললেন—ও, তোমার কাপড় পুরানো হয়ে গেছে বুঝি। বুড়ি মা! আমার এই গায়ের কাপড়খানা তুমি নাও, বলে তিনি কাঁধের ভাঁজ করা পরিচ্ছন্ন নতুন কাপড়খানা তাকে দিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা, জ্যোতিরাও এর মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে কেঁদে ফেললেন, দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—তোমরা স্বামী-স্ত্রী, গরিবের দেব-দেবী। একজন দিলে খাবার, একজন দিলে কাপড়।

জ্যোতিরাও কৃষকদের মধ্যে বাস করতে ভালবাসতেন। তিনি আন্তরিকভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ; সুখে দুঃখে একাত্ম হতেন। দরিদ্রের প্রতি প্রেম, সত্যের প্রতি অনুরাগ, তাঁর অর্ধ উলঙ্গ শরীর ও ব্যবহৃত লাঠি দেখে পরবর্তীকালে অনেকেই তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন, যদিও সামাজিক ভাবে তিনি মহাত্মা গান্ধিজীর বিপরীত মেরুর মানুষ ছিলেন।

জ্যোতিরাও এর ষাট বৎসর বয়সে তাঁর বন্ধের অনুগামীগণ তাঁকে সম্বর্ধনা দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জ্যোতিরাও জনগণের মধ্যে ঋষির মত ছিলেন এবং অতি সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করেছেন। তিনি হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মানুষ, যিনি অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষদের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন।

১৮৮৮ সালের ১১ মে দুপুর বেলায়, মাণ্ডবীর কোলীওয়াদা হল-ঘর, দেশের অবহেলিত ও দরিদ্র জনগণের ভীড়ে উপচে পড়ল। অগণিত বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযোদ্ধা, অস্পৃশ্য ও নিরক্ষর মানুষের পরম বান্ধব যিনি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ এক সুবর্ণ সুযোগ। হল-ঘর লোকে পরিপূর্ণ ! ময়লা টুপি, ছেঁড়া পাগড়ী, অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরিহিত প্রাণোচ্ছল মানুষের ভালবাসা ও গর্বে উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে সভার পরিবেশ কোলাহল মুখর। দারিদ্র্য-পীড়িত, ক্ষুধার্ত, আগামী শুভদিনের আশাবাদী জনগণের জন্য দুঃখবরণকারী, জীবনপণ সংগ্রামী, একজন মহান নেতার গৌরব শীর্ষে আরোহণের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রভূত ধনের অধিকারী সম্মানিত হন, পরাধীন দেশের মুক্তি সৈনিকও প্রশংসা লাভ করেন ; কিন্তু একজন দরিদ্র সমাজসেবীর আত্মত্যাগের প্রতি জনগণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ আগে কখনও দৃষ্ট হয় নি।

সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ জ্যোতিরাও দেশের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য যে অসাধারণ, মহান ও নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ আবেগ আপ্লুত হয়ে বক্তব্য রাখলেন। দলিত, পতিতের মানবিক অধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আপসহীন সংগ্রামকে অভিনন্দিত করলেন জনগণ। তারপর তাঁরা, তাঁদের প্রাণের মানুষ, ভালবাসার মানুষ, পরম বান্ধব জ্যোতিরাওকে 'মহাত্মা' উপাধি দানে সম্মানিত করলেন। করতালি ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল পরিপূর্ণ হল-ঘর। নিরক্ষর, দরিদ্র, অসহায় মানুষের ভক্তি ও ভালবাসায় অভিভূত হলেন জ্যোতিরাও। তিনি বিনীতভাবে বললেন—"আমার কাজ শেষ হয় নি; এই কাজকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা 'সত্যশোধক সমাজের' উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, সমাজের জন্য সবাই সাধ্যমত আত্মত্যাগ করুন, তাতেই আমার আনন্দ।"

জ্যোতিরাও এখন জনগণের দেওয়া সম্মানে সম্মানিত 'মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে'। জাতির প্রতি ভালবাসা, দেশের প্রতি ভালবাসা, সমাজের প্রতি দরদ, চরিত্রমাধুর্য, নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা, উদারতা, সততা ও মহত্ব যার ভিতরে থাকে, তিনিই 'মহাত্মা'। জ্যোতিরাওই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম মহামানব, যাঁকে দেশের সাধারণ মানুষ এই সর্বোচ্চ উপাধি ও প্রশংসায় ভূষিত করেছেন। পরবর্তী কালে শিশিরকুমার ঘোষ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

শেষজীবন ও মহাপ্রস্থান

১৮৮৮ সালে জুলাই মাসে জ্যোতিরাও হঠাৎ রোগাক্রান্ত হন, শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত দেখা দেয়, তবু তাঁর কলম থামল না। তিনি বাঁ হাতে লিখতে আরম্ভ করলেন। কাজ ছিল তাঁর জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত অপরিহার্য। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি 'দীনবন্ধু' পত্রিকার জন্য লিখে চলেছেন। জ্যোতিরাওকে কেবল মহারাষ্ট্রের সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত না বলে ভারতীয় দলিত-সাহিত্যের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর পাতায় পাতায় বঞ্চিত মানুষের বেদনার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ঐ সালের সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত জ্যোতিরাও শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। সেই সময়ে অসুস্থ শরীরে তাঁর খুড়তুতো ভাই জ্ঞানোবা সসেনের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজের জীবনের বিভিন্ন ভাবনা, চিন্তা, অভিজ্ঞতার কথা লিখে শান্তি পেতেন। প্রত্যেক চিঠির উপরে তিনি লিখতেন 'সত্যমেব জয়তে'। সেই স্বর্ণোজ্জ্বল প্রবাদ বাক্য, পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও বাণী হয়ে গেছে। মহাত্মা জ্যোতিরাওএর জীবন সাধনাই ছিল সত্য উপলব্ধি।

জ্যোতিরাও গদ্য অপেক্ষা কবিতা লিখতেন বেশী। তাঁর কবিতায় আছে জাতীয় জাগরণ মন্ত্র। 'সার্বজনিক সত্যধর্ম' পুস্তকে তিনি লিখেছেন—সকল ধর্মগ্রন্থ মানুষেরই রচনা ; সেগুলি আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয় সত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। 'বাইবেল' ও 'কোরাণ' সকলের জন্য উন্মুক্ত ; কিন্তু 'বেদ' নয়। 'বাইবেল' ও 'কোরাণ' বিশ্বাসীদের ভয় নাই ; কিন্তু 'বেদ' বিশ্বাসীদের ভয় আছে। কেন না এর মধ্যেকার দুর্বলতা যদি ধরা পড়ে, তাই সকলকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া হয় নি।

জ্যোতিরাওএর অভিমত হল স্বর্গ বলে কিছু নাই। নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতা ছাড়া সকলের ঋণ শোধ করা সম্ভব। স্ত্রী লোক স্বভাবতই দুর্বল, পুরুষ লোভী ও সাহসী ;

সুতরাং সে নারীকে ইচ্ছানুসারে স্বার্থপরভাবে নিজের অধীনে রেখে তার স্বাধীন ও মুক্ত জ্ঞানলাভে বাধা দেয়। বহু বিবাহ নিষ্ঠুরতা। পুরুষ লোভ, ঘৃণা ও পাপের উৎস। নারী পুরুষের মধ্যে আইনের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারে ; কিন্তু নারীর পক্ষে তা বরদাস্ত করা হয় না। জাতিভেদ প্রথা এক প্রকার ভণ্ডামি। মানব ইতিহাসের আদিতে কোন জাতিভেদ ছিল না, আর্য ও ব্রাহ্মণগণ তাদের স্বার্থেই এই ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের জন্য ভিন্ন আইন থাকাও সমীচীন নয়।

জ্যোতিরাও বলেছেন - ঈশ্বর অজ্ঞেয় ও অপ্রাপ্য। ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়। অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলতে কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানুষের ভবিষ্যৎ গঠনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন ভূমিকা নাই। এই সব ব্রাহ্মণদের মিথ্যা ভাওতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে—জ্যোতিরাও, তাঁর পালিতপুত্র যশোবন্তকে 'রাধা' নামে সদ্বংশজাত এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর স্নেহবশতঃ কন্যার নাম রাখা হল 'চন্দ্রভাগা'। তাঁর নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বিবাহ হল। বর-কন্যা জাগতিক ও সাংসারিক কাজকর্ম বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিপালন করবার প্রতিশ্রুতিতে জ্যোতিরাও লিখিত সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তাঁরা ভারতীয় নারীদের মুক্তি ও অধিকার লাভের জন্য কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত গুরুজন ও অতিথিবর্গ সমস্বরে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। বুদ্ধিমতী, শক্তিময়ী, প্রাণোচ্ছল পুত্রবধূ পেয়ে জ্যোতিরাও খুব খুশী হলেন।

অসুস্থ শরীরেও জ্যোতিরাও নিপীড়িত ও দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ছিলেন। ১৮৮৯ সালের জুন-জুলাই মাসে বম্বে ও আলিবাগ মিউনিসিপালিটির মাহার ও ঝাড়ুদারগণ তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেন ; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জ্যোতিরাও এর পরামর্শ অনুসারে একদিন ঐ মেহনতি

শ্রমিকগণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। ধর্মঘটে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের চাকরী গেল, তবু ধর্মঘট থামল না। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ঐ নিম্নশ্রেণীর শ্রমিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পুনরায় চাকরীতে বহাল হলেন।

জ্যোতিরাও দীর্ঘ চল্লিশবৎসর ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে আসছিলেন। বিধবাদের অমর্যাদাকর দুর্দশা দেখে অন্তরে বেদনা অনুভব করছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ সংগ্রাম—বিধবাদের মস্তক মুণ্ডনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ। তিনি বললেন, কোন ক্ষৌরকার যদি এই কাজ করে তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। সত্যশোধক সমাজ, 'দীনবন্ধু' পত্রিকায় এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই সব প্রবন্ধের সপক্ষে বম্বের সংসারত্যাগী রাজনীতিবিদ মামা পরমানন্দ প্রশংসা ও সমর্থন জানালেন। ১৮৯০ সালের ১৪ এপ্রিল, এলফিনস্টোন হাই স্কুলের পিছনে ক্ষৌরকারদের এক বড় সভা হয়েছিল। সহস্রাধিক ক্ষৌরকার সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদেরই নেতা সদোবা কৃষ্ণজী সভাপতিত্ব করেন এবং হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য সব ক্ষৌরকারই স্বীকার করলেন—নিরপরাধ বিধবাদের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁরা পাপের কাজ করেছেন। আর কখনও ওই কাজ করবেন না বলে তাঁরা অঙ্গীকার করলেন।

লণ্ডনের মহিলারা যখন বম্বের ক্ষৌরকার আন্দোলনের খবর শুনলেন তাঁরা ভারতীয় বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ক্ষৌরকারদের সমর্থন জানালেন। এই খবর প্রকাশিত হয় লণ্ডনের 'উইমেন পেনী' পত্রিকায়।

জ্যোতিরাও লিখিত 'সার্বজনিক সত্যধর্ম' পুস্তকখানি, তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ভারতের অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল ডঃ ভি. আর. ঘোলে এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন—"জ্যোতিরাও তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে প্রকাশ করেছেন যে, মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা, কিভাবে জাতিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গেছে। কেউ ঈশ্বরের আকৃতি দেখেন নাই; সুতরাং কারও

পক্ষে তাঁর মূর্তিগড়াও সম্ভব নয়। তবু সুদীর্ঘকাল কল্পিত মূর্তিপূজার মাধ্যমে শোষণ চলছে। সমাজে হিংসা, বিরোধ, অনৈক্য ও দাসত্বের মূল কারণ জাতিভেদ প্রথা। মহাত্মা জ্যোতিরাও দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সমাজে অতি সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক অনেক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা দূর করতে সফল হয়েছেন। তিনি জনগণকে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সমাজে ধর্মের নামে সীমাহীন শোষণ চলছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।"

ভাবনা, চিন্তাও লেখায় নিমগ্ন জ্যোতিরাও ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। হিন্দুধর্ম হতে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত রেভারেণ্ড বাবা পদ্মনজী একদিন তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি জ্যোতি-রাওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর অন্তর শান্তিপূর্ণ কি না, জীবন সায়াহ্নে তিনি কোন উদ্বেগ বোধ করছেন কি না ? জ্যোতিরাও অতি শান্তস্বরে উত্তর দেন—তিনি অত্যন্ত নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করে জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করেছেন। তাঁর কোন ভয়, ভীতি বা অনুতাপ নাই। তাঁর অন্তর সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ।

জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি 'সত্যশোধক সমাজের' কর্মীদের ডেকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করতে বললেন। তাদের চোখে জল দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মৃত্যুতে শোকের কিছু থাকতে পারে না ; কেন না পার্থিব সকল বস্তুরই ক্ষয় আছে। তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন তার স্ত্রী ও পুত্রকে দেখা-শোনা করেন ; তিনি আশা করেন, তারাও দলিত ও পতিতদের মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন।

১৮৯০ সালের ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার জ্যোতিরাওএর স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি ঘটল। তিনি অনুভব করলেন সময় সংক্ষেপ, সন্ধ্যা পাঁচটায় তাঁর পরিবারের সকলকে বিছানার পাশে ডাকলেন। তিনি একে একে সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে ন্যায় ও সত্যের পথে অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে উপদেশ দিলেন। স্ত্রীকে কাছে ডেকে শেষ বিদায় চাইলেন। স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ভক্তি-বিনম্র চিত্তে বিষণ্ণভাবে সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে

তাকিয়ে রইলেন।

জ্যোতিরাও পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন— "তোমার মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে"। তারপর উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অনুগামীদের দিকে শেষবারের মত একবার তাকিয়ে জ্যোতিরাও আস্তে আস্তে পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন, দু'হাত বাড়িয়ে যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

রাত্রি দুটো কুড়ি মিনিটের সময় জ্যোতিরাওএর চৌষট্টি বৎসরের ক্লান্ত হৃদ্‌পিণ্ড একেবারেই থেমে গেল। অশ্রুসজল শোকার্ত আত্মীয় পরিজনদের মাঝে একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

দুঃসংবাদ চারিদিক দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল। ভোর না হতে দূর দূরান্ত থেকে অস্পৃশ্য, দরিদ্র নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ ছুটে আসতে লাগল মহাত্মাকে শেষ বারের মত দেখার জন্য। অগণিত শোকার্ত মানুষের ভীড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। বাড়ীর সামনে একটি আরাম কেদারায় মহাত্মাকে শুয়ে রাখা হল। শোকস্তব্ধ নরনারী, চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তাদের জীবন যুদ্ধের শক্ত তরবারি খানা, আজ ভেঙ্গে গেল। অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের পরিত্রাতা, একটু পরেই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবেন।

২৮ নভেম্বর সকালে সুগন্ধী জলে মহাত্মাকে স্নান করান হল ; পরিচ্ছন্ন পোষাক পরান হল। তাঁরই শবাধারে শত শত পুষ্পমাল্য অর্পিত হল। মহাত্মার অনুরাগী, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব তাঁর শবাধার উত্তোলন করলেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত নারী পুরুষ সকলে শবযাত্রার অনুগমন করলেন। দর্শনেচ্ছু মানুষের ভীড় ঠেলে তাঁর মরদেহ নিয়ে শ্মশান ভূমিতে পেঁাছাতে দুঘণ্টা সময় লেগে গেল।

জীবিত কালে জ্যোতিরাও তাঁর দানপত্রে উল্লেখ করেছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ যেন সমাধিস্থ করা হয়। শবযাত্রার অনুগামী, আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ সেই নির্দেশ কার্যকর হল না। মহাত্মার শবদেহ চিতায় রাখা হল ; তাঁর

পালিত পুত্র যশোবন্ত, মৃত পিতার কল্যাণ প্রার্থনা করে ভক্তি বিনম্র চিত্তে চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন। অসংখ্য শোকসন্তপ্ত মানুষের চোখের সামনে মহাত্মা জ্যোতিরাওএর পার্থিব দেহ ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হল।

মৃত্যুর তৃতীয় দিনে জ্যোতিরাওএর কয়েক শত অনুরাগী, ঘোড়ার গাড়ী ও পাল্কি নিয়ে মাদল ও ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে তাঁর বাসভবনে সমবেত হলেন। তারপর সেখান থেকে সকলে শোভাযাত্রা করে শ্মশান অভিমুখে অগ্রসর হলেন। শ্মশানের বিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সকলে সমস্বরে জ্যোতিরাওএর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একখানি ভক্তিগীতি গাইলেন। তারপর তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম তুলে একটি জলপাত্রে রাখলেন। সেই ভস্মাধার একখানি সুসজ্জিত পাল্কির মধ্যে রেখে, জ্যোতিরাওএর নামে জয়ধ্বনি করতে করতে সকলে আবার ফিরলেন। শোভাযাত্রা চলতে চলতে কিছু দূর গিয়ে থেমে গেল—জ্যোতিরাও এর জীবিতকালের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট স্থানে সেই পবিত্র চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হল। তারপর সমবেত প্রার্থনায় চোখের জলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন সকলে। মহাত্মা জ্যোতিরাওএর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ভাউ কোণ্ডজী পাতিল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

"যে মহাপুরুষ, শূদ্র ও অতি-শূদ্রদের মুক্তি ও মানবিক অধিকার লাভের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সকল মানুষের শেষ পরিণতির ন্যায় তিনিও আজ চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি চিরস্থায়ী। আমরা অজ্ঞ, তাই এই মহাপুরুষের মহত্ব আমরা মূল্যায়ন করতে অক্ষম। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সত্য সন্ধানীরা তাঁর জীবনচরিত পাঠ করবেন, তারা তাঁর মহত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তাদের অন্তর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হবে। আসুন আমরা তাঁর জীবন সাধনা, আমাদের জীবনে সঞ্জীবিত করে রাখি।"

জ্যোতিরাওএর জয়যাত্রা

জ্যোতিরাও চলে গেলেও তাঁর 'সত্যশোধক সমাজ' নিষ্ঠা সহকারে তাঁর জীবনাদর্শকে বহন করে চলেছে। জ্যোতিরাওএর নিপীড়িত মানুষের সেবাকে যারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়, কোলাপুরের মহারাজা শাহু মহারাজ, মাধবরাও সিন্ধে, ভাস্কররাও যাদব এবং ভাউরাও পাতিলের। সকলেই ছিলেন 'সত্যশোধক সমাজের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক।

এরা সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে জ্যোতিরাওএর আদর্শকে বহন করে চলেছেন এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর আরব্ধ কাজকে রূপায়ণ করে গেছেন। বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের কথা কেনা জানে? তাঁরই প্রদত্ত বৃত্তিতে বাবাসাহেব আম্বেদকর আমেরিকা ও ইংলণ্ড গিয়ে বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের অন্দর মহলের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছিলেন।

কোলাপুরের শাহু মহারাজের অবদান আজ শূদ্র ভারতের প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন। জ্যোতিরাও ফুলের আবির্ভাব না ঘটলে এই সব মহান সমাজ বিপ্লবীদের আমরা মানবতা বিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতভূমিতে দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ।

জ্যোতিরাও তাঁর শেষ গ্রন্থে একটি ভবিষ্যৎ বাণী লিখে গেছেন—"যতদিন না অতিশূদ্র বা অস্পৃশ্য ভীল-কোলিদের ঘরের সন্তান যথার্থ শিক্ষালাভ করে সমাজে মাথা উচু করে বেরিয়ে আসবে, ততদিন আমাদের কবরের উপর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে কেউ আমাদের জয়গান করবে না।"

জ্যোতিরাওএর এই ভবিষ্যৎ বাণীর যথার্থ রূপায়ণ হল বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকর। একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাবাসাহেব আম্বেদকর হলেন জ্যোতিরাওএর আদর্শ-সৃষ্ট মানসপুত্র। জ্যোতিরাও না হলে ভারতরত্ন আম্বেদকরকে আমরা মনুবাদী ভারতে পেতাম কিনা—এ প্রশ্ন মোটেই অযৌক্তিক হবে না।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই ; কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব আমরা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি। তাঁর অন্যতম উত্তর সাধক পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর আদর্শকে আজ সারা ভারতব্যাপী ব্যাপকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। তিনি যে সামাজিক সংস্কারের মহীরুহের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, আজ তা ফুলে-ফলে সার্থকতার পথে ক্রমবর্ধমান। আজ সারাদেশব্যাপী শূদ্র এবং অন্যান্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের জাগরণের মাধ্যমে যে নূতন ভারত গড়ে উঠেছে তার স্রষ্টা হলেন মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে। এই সত্যটিই আজ প্রভাত সূর্যের আলোকছটার ন্যায় দিন দিন প্রতিভাত হচ্ছে যে, খেতরীর মহারাজা প্রদত্ত মহাত্মা উপাধি-ধারী গান্ধিজী নন, নব ভারতের জাতির জনক হলেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপাধিপ্রাপ্ত মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে। আজ তাঁর জীবনাদর্শের জয়যাত্রা কোটি কোটি কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ভারত থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কালিমাকে নির্মূল করতে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছে। জয় জ্যোতি ! জয় ভীম !!

———

ডঃ আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯০) প্রাপ্ত
রণজিত কুমার সিকদারের লেখা পুস্তকসমূহ

১। বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর — ৫০.০০
২। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী — ১০.০০
৩। ভারতরত্ন আম্বেদকর (স্কুলপাঠ্যের উপযোগী) — ১২.০০
৪। বুদ্-বুদক (বাণী-সংগ্রহ) ; ৫। ভারতের জাতিসমূহ (অনুবাদ) — ৬.০০
৬। জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি (অনুঃ) ; ৭। ভারতরত্ন আম্বেদকর (হিন্দী) — ১৫.০০
৮। রাণাডে, গান্ধী এবং জিন্না (অনুবাদ) — ৮.০০
৯। অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তি ও গান্ধিজী (অনুবাদ) — ৬.০০
১০। ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা — ৪.০০
১১। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর — ৪.০০
১২। আম্বেদকরবাদ—৮.০০ ; ১৩। ব্রাহ্মণ্যবাদ — ৬.০০
১৪। দলিতবাদ, বামসেফ ও ডি. এস. ফোর — ৫.০০
১৫। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট (পঃ বঙ্গ)—২.৫০ ; (৫টি রাজ্য) — ৬.০০
১৬। ৮ খণ্ডে আম্বেদকর রচনাবলী ; প্রতি খণ্ড — ১০.০০
১৭। রাষ্ট্র এবং সংখ্যালঘু (অনুবাদ) ; ১৮। অভিযান (কাব্যগ্রন্থ) — ১০.০০
১৯। গোমাংসপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ কেন নিরামিষভোজী হল ? (অনুবাদ) — ৬.০০
২০। অস্পৃশ্যদের যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় (অনুবাদ) — ৩.০০
২১। নিদ্রিত সমাজকে জাগাল যারা (স্কুলপাঠ্যের উপযোগী) — ১২.০০
২২। মুক্তিদূত কাশীরাম ও তার নূতন আশা — ৫.০০
২৩। পুনাচুক্তি : পটভূমি ও ফলশ্রুতি (অনুবাদ) — ৬.০০
২৪। গোলটেবিল বৈঠক ও গান্ধিজীর ষড়যন্ত্র (অনুবাদ) — ১০.০০
২৫। অস্পৃশ্যদের মৌলিক সমস্যা (অনুবাদ) — ৪.০০
২৬। কংগ্রেস ও গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছেন ? (অনুবাদ) ৩টি খণ্ড ; প্রতি খণ্ড—২০.০০ ; ২৭। একখণ্ডে — ৭১.০০
২৮। বাবাসাহেব আম্বেদকর (রঙীন ; মুদ্রণরত) — ২০.০০
২৯। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ—২০.০০ ; ৩০। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা — ৪.০০
৩১। বাংলার শার্দুল রসিকলাল বিশ্বাস — ১০.০০
৩২। পাকিস্তানের বিকল্প কি ? -২০.০০ ; ৩। ছোটদের আম্বেদকর — ৬.০০
৩৪। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং তার গোলামগিরি — ২০.০০
৩৫। গান্ধীবাদ : তফসিলীদের মৃত্যুদণ্ড — ৮.০০
৩৬। তফসিলীরা গান্ধিজী থেকে সাবধান ! — ৮.০০
৩৭। তফসিলিদের প্রতি গান্ধিজী ও কংগ্রেসের ধোঁকাবাজি — ৮.০০